পঞ্চম রাগ

পঞ্চম রাগ

নরেন্দ্র ঘোষ



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই অগ্রহায়ণ,
১৮৮২ শকাব্দ

৩·২৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক

শ্রীফণি মজুমদার সুরসিকেষু



রুস্তম আলী হাসল। যাক্, এক আধ দিন জিরোন যাবে এবার। ঘড় ঘড় শব্দ তুলে নোঙর-বাঁধা মোটা শেকলটা জলের দিকে নামতে লাগল। রহিম ও কেরামৎ মোটা দড়ি দুটোকে ছুঁড়ে দিল জেটির ওপর। বন্দরের গণেশ আর সেলিম তা লুফে নিল, জেটির পাশের লোহার খুঁটির সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁধল। শেষবারের মত জাহাজের চাকা দুটো পদ্মার ঘোলা জলকে সবেগে ও সশব্দে আবর্তিত করল, শেষবারের মত জাহাজের বাঁশিটা একটা দৈত্যের গর্জনের মত বাতাসে ভেসে গেল। সেই শব্দে নদীর ধারের গাছপালা থেকে পাখির দল ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ল, কিছুক্ষণ তারস্বরে ডাকল, তারপর বাঁশির শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আবার আশ্বস্ত হয়ে গাছের মাথায় বসল। মালবাহী জাহাজ এস. এস. রত্না মীরপুর বন্দরে থামল।

সেই ভোর বেলায় এসেছিল প্রতিদিনকার প্যাসেঞ্জার জাহাজটা। কুড়ি মিনিট বাদে তা ছেড়ে গিয়েছিল, তারপর এই সাত আট ঘণ্টা একেবারে চুপচাপ ছিল বন্দরটা। মাঝে মাঝে শুধু কুলিদের, স্টেশন মাস্টার ও মালবাবুর চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। তা ছাড়া ঘাটে স্নানরত বৌ, ঝি ও শিশুদের কোলাহল, পদ্মার জলকল্লোল আর কাক চিলের ডাক ভেসে আসছিল। কিন্তু কোন ব্যস্ততা ছিল না তাতে। অবিচ্ছিন্ন ও মন্থর একটি অদৃশ্য ধারা যেন সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল। তারপরে এই এতক্ষণে বন্দরটা আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। জাহাজের হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে থেমে এল, ভরা পদ্মার ওপর তা মৃদুমন্দ দুলতে লাগল। পল্টুন বেয়ে স্টেশন মাস্টার হোসেন মিঞা এল জাহাজের ওপর, পেছনে মালবাবু হরিদাস মিত্তির।

জাহাজের কাপ্তেন মিঃ টমাস। সাহেব লোক, তবে বিলিতী নয়, দেশী—খাস চট্টগ্রামের বাসিন্দা। সাহেবের পরিবার বলে কিছু আছে কিনা জানা নেই, সে বিষয়ে কিছু বলেও না সে। তবে রুস্তম আলী ও অন্যান্য খালাসীরা তার ঘর সাফ করতে গিয়ে দেখেছে যে, সাহেবের টেবিলের ওপর, কাগজের ফুলওয়ালা একটা ফুলদানীর সামনে একটি ফ্রক পরিহিতা খর্বনাসা যুবতীর ফটো আছে। যুবতী দেশী নয়, মিশ্রিত। সেই ফটোর মেয়েটির সঙ্গে টমাস সাহেবের একটু যোগাযোগ আছে বলেই অনুমান করে জাহাজের লোকেরা। সারেঙ ইয়াকুব মিঞার মত এই যে, ঐ মেয়েটির জন্য সাহেবের হৃদয়ে খুব দর্দ ছিল, কিন্তু মেয়েটির হৃদয় প্রস্তর-কঠিন হওয়ায় সাহেব তাকে পায়নি। ইয়াকুব মিঞার কথা কেউ অবিশ্বাস করতে চায় না। কারণ ইয়াকুবের বয়েস হয়েছে, চার বক্ত্ নমাজ পড়ে সে, পুণ্য এবং বয়স তার দাড়ি গোঁফে শুভ্রতার আবীর ছড়িয়েছে। তাছাড়া রাতের বেলায়, হুইস্কি-মত্ত টমাস সাহেবকে কি ঐ ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি সবাই? তারা কি দেখেনি যে নেশার ঘোরে ছবিটার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে টমাস সাহেব, কথা বলে আর কাঁদে আর ছোরা শান দেওয়ার মত দাঁতে দাঁত ঘষে? শুধু তাই নয়, সাহেবকে মদ খেতে দেখেছে তারা, তাকে তারা অকুণ্ঠ গালিগালাজ দিতে শুনেছে কিন্তু কোনদিন তাকে মেয়েমানুষ সম্পর্কে দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেনি। বিষয়ে সত্যি সে অস্বাভাবিক, আশ্চর্য।

টমাস সাহেব ওপর থেকে নেমে আসছিল।

হোসেন মিঞা সহাস্যে সেলাম জানিয়ে বলল, "গুড মর্নিং মিঃ টমাস—মিটিং অনেকদিন পরে, কি বলেন?"

মিঃ টমাস মাথা নাড়ল, "ইয়েস, কামিং আফটার থ্রি মানথ্স্—গুড মর্নিং"—

মালবাবু বলল, "ভেরি গ্ল্যাড টু সী ইউ ছার—ওয়েলকাম"—

মিঃ টমাস পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, "নাউ অ্যাবাউট ডিউটি মিঞা সাব—কি কি মাল আছে?"

"সব পাট সাহেব—তিন হাজার মণ"—

"হুঁ—ছাট মীনস্ থ্রি ডে'জ—তিনদিন থাকতে হবে।"

মালবাবু, শেয়ালের মত হাসল, দু'চোখ পিটপিট করতে করতে বলল, "হেঁ হেঁ—ফেট ছার, ফেট—অ্যাবসেণ্ট ফর থ্রি মানথ্‌স্, দেয়ারফোর স্টে ফোর থ্রি ডে'জ—হেঁ—হেঁ"—

মিঃ টমাস কিন্তু একটুও নড়ল না, মালবাবুর রসিকতায় কোন প্রতিক্রিয়াই তার মধ্যে দৃষ্ট হল না। কেবল ভুরু কুঁচকে সে একবার বাঁকা চোখে তাকাল, মালবাবুর হাসিকে তার গলার মধ্যে আটকে দিল।

হোসেন মিঞা অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দ্রুতকণ্ঠে বলল, "তাহলে টেক রেস্ট ক্যাপ্টেন—মুরগী অ্যাণ্ড মাছ ভেরী চিপ হিয়ার"—

রুস্তম আলী তার পেশল বাহু দুটোকে দু'দিকে প্রসারিত করে বলল, "আঃ—বাঁচলাম, তিনদিন জিরোন যাবে এবার"—

রহিম চোখ টিপে হাসল, বলল, "যা বলেছিস, সন্ধ্যের পর জমবে ভালো"—

কেরামৎ মাথা নাড়ল, "কিন্তু একটা কথা"—

"কি?"—

"সেই বাদশা মিঞা বেঁচে আছে তো? সেবার একদিনেই কিন্তু ব্যাটা হুরীদের মেলা দেখিয়ে দিয়েছিল"—

রুস্তম হাসল, "বেঁচে থাকবে না কেন রে শালা? শয়তানের বাচ্চারা কি তাড়াতাড়ি মরে? ঠিক বেঁচে আছে বুড়ো"—

"এ্যাই হারামীরা—কি হচ্ছে এখানে?"

মিঃ টমাস এসে দাঁড়াল সেখানে, ঝকঝকে ও বড় বড় দাঁত মেলে ক্রুর হাসি হাসল।

রুস্তম হাসবার চেষ্টা করল, বলল, "এই একটু বাৎচিৎ করছি হুজুর"—

টমাস গর্জে উঠল, "শাট আপ—বাজে কথা বলো না শালারা—যাও, ডেক ধুয়ে ঠিক করো গে"—

"জী হুজুর—যাচ্ছি"—

তিন বন্ধু পালাল সেখান থেকে।

মৃদু হেসে টমাস বিড়বিড় করে বলল, "ব্লাডি সোয়াইন—দি হোল গ্যাঙ্গ অফ দেম"—

আড়ালে গিয়ে রুস্তমও বিড়বিড় করে বলল বন্ধুদের, "শালা বেজম্মার বাচ্চা—হারামজাদার ব্যাটা হারামজাদা কেরেস্তান"—

রহিম কেরামৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল।

খানাপিনার পালা চুকল। বিকেল হয়ে এল। প্রথম হেমন্তের পদ্মা, তবু তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। বিকেলের দিকে একটু হাওয়া উঠল, ওপারের ক্ষীণ বনরেখা ধুলো বালিতে অদৃশ্য হয়ে গেল, বড় বড় ঢেউ তুলে রাক্ষসী পদ্মা যেন নাগিনীর মত গর্জাতে লাগল। সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় এস. এস. রত্না দুলতে লাগল, দুলতে লাগল জেটি আর গাধাবোটটা। আর ওপরের ডেকে চুরুট মুখে দিয়ে নিঃসঙ্গ গরিলার মত মিঃ টমাস পায়চারি শুরু করল। নদীর বুকে ঝড়ো হাওয়া উঠলেই টমাসের চেহারা বদলে যায়। প্রকৃতির অশান্ত মূর্তিকে আশ্রয় করে তার মনের অশান্তিও তখন যেন মুক্তি পায়।

ঘাটের ওপরে কাজ শুরু হয়েছে। গুদামের ভেতরকার জমা করা পাটের বাণ্ডিল নিয়ে কুলিরা গাধাবোটটা বোঝাই করছে। নিকেলের

চশমা চোখে মালবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব কিছু, তার পাশে দু'জন জোতদার মহাজন। বুড়ো সারেঙ ইয়াকুব মিঞা বসে বসে একটা উর্দু গজল গাইছিল নীচে। ভাঙা গলা, তবু বুড়োর শখ কম নয়।

রুস্তম ঠাট্টা করে বলল, "চাচা'র মনে দেখছি এখনো রঙ আছে?"

ইয়াকুব মিঞা চোখ পাকাল, "কেন থাকবে না রে উল্লু? আমি কি খোদাহ্‌তালার দুনিয়ার বাইরের জীব?"

রুস্তম সুর নিচু করে বলল, "তাহলে চল চাচা—আজ রাত্তিতে"—

"কোথায়?" না বোঝার ভান করল বুড়ো সারেঙ।

"একটু রঙ তামাশা করবে"—

ইয়াকুব মিঞা জিভ কেটে বলল, "তওবা, তওবা—তুই আমার ভাইপো নয় রুস্তম, তুই আমার শালা"—

"চটো না চাচাজান"—

ইয়াকুব মিঞা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "চটব না! কেন? আচ্ছা রুস্তম, কোনদিন কি খেয়াল করেছিস শালা যে তোর উমর কত হল?"

রুস্তম একটু দমে গেল। কেউ বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই সে নিভে যায়, সমস্ত অতীতটা যেন একটা আগুনের শিখা হয়ে তাকে স্পর্শ করে, তার দেহমনকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়।

নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ল সে।

ইয়াকুব মিঞা সহাস্যে ডাকল, "ওরে রুস্তম, শোন্—রাগ করলি নাকি?"

রুস্তম জবাব দিল না।

পেছন দিকের রেলিঙ ধরে সে ঘাটের দিকে তাকাল। কয়েকটি মেয়ে এসে বড় বড় ঘোমটা টেনে জলে চান করছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় পদ্মের ডাঁটার মত দুলছে তাদের দেহলতা। ওদিকে বেলা পড়ে

এসেছে। মীরপুরের গাছপালার পেছনে নেমেছে সূর্য, রোদের রং হয়েছে কমলালেবুর মত। শন্‌শন্‌ হাওয়া বইছে, তীরের ওপর সশব্দে মাথা খুঁড়ছে পদ্মা, গাছপালাগুলো দুলছে, সব মিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ। মনটা কি যেন চায়, কি যেন চায়। বয়েস? কত? তা প্রায় চল্লিশ হল। সাত বছর আগে—যাক সে কথা। কি এমন বয়েস হয়েছে তার? চল্লিশ খুব বেশী নয়। তাতে দুঃখ নেই। সে কথায় দুঃখ হয় না। দুঃখ হয় অতীতকে মনে পড়ে বলে। যাক, যাক সে কথা—

মেয়েরা চান করছে। ঘোমটা ঢাকা মুখ তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ দেখতে ইচ্ছে করে। নদীর মধ্যে মেয়েরা। মেয়েরাও যেন নদীর মত। গভীর, ভয়ঙ্কর, প্রাণদায়িনী। ভারী ভালো লাগে রুস্তমের। সামনে জল, নরম মাটি, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ আর নারীমূর্তি। ভারী সুন্দর।

হঠাৎ একটি মেয়ের ঘোমটা একটু সরে গেল। মুহূর্তের ব্যাপার। বিদ্যুতের মত। বয়স আন্দাজ সাতাশ আটাশ, কিন্তু দেখতে ভারি মোলায়েম, ভারি করুণ। রুস্তমের মনটা ভার হয়ে উঠল। একদিন এমনি উতলা পরিবেশে অমনি একটি নারী এসে দাঁড়াত তার পাশে, তাকে স্পর্শ করত, আধো আধো কথায় তাকে—থাক, হাড়গুলোকে কবরে চাপা দেওয়াই ভাল।

তৃষ্ণা। একটা দুর্নিবার, সুবিপুল তৃষ্ণা। আকণ্ঠ।

সেখান থেকে ছিটকে চলে গেল রুস্তম। রহিম আর কেরামৎ এক কোণে বসে বিড়ি টানছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল সে।

রহিম ঠাট্টা করে বলল, "কি হল ইয়ার, মুখে বাদল নামল যে!"

রুস্তম বলল, "ইয়ার্কি নয়, এবার চল"—

"কোথায়?"

"সাহাবুদ্দীনের হোটেলে বাদশা মিঞার খোঁজ করব।"

"শালা সায়েব দেখে ফেলবে"—

"দেখবে না, চল—"

ধোয়া লুঙ্গির ওপর হাতকাটা হাফসার্ট চাপিয়ে, রঙীন চামড়ার মনিব্যাগ ও ছোরা ট্যাকে গুঁজে, তিনজনে বেরোল চুপি চুপি। শুধু ইয়াকুব মিঞাকে জানিয়ে এল একবার। বুড়ো আপত্তি করল না।

কিন্তু ওরা এতটা আশা করেনি। জাহাজের কাপ্তেন যে চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসে থাকবে তা কে ভেবেছিল?

সবে পণ্টুনটা পার হয়েছে তারা, এমনি সময়ে পেছন থেকে বাজখাঁই গলায় ডাক শোনা গেল, "এই—কিদার যাতা হ্যায়—শালা ব্লাডি সোয়াইন?"

পায়ে পায়ে ফিরে এল তিনজন, বুনো জানোয়ারের মত দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

"কাঁহা ভাগতা হ্যায় তুম্‌লোগ? এঁ্যা? হোয়াই আর ইউ রানিং—ইউ থীভস্—টু হুইচ হেল্?"

উদ্ধত ভঙ্গীতে রুস্তম বলল, "একটু গঞ্জে যাচ্ছি হুজুর—বেড়াতে।"

বড় বড় ঝকঝকে দাঁত মেলে টমাস হাসল, "হ্যাঁ? গোয়িং ফর এ স্ট্রোল? শালা ড্যাম মিথ্যাবাদী কোথাকার—সত্যি কথা বলতে জানো না?"

"সত্যি কথাই বলছি হুজুর"—

"বটে!" সাহেব আবার হাসল, "তার চেয়ে বল না কেন যে, মদ আর মেয়েমানুষের জন্য যাচ্ছ—এঁ্যা।" হঠাৎ গর্জে উঠল সে। আবার পরমুহূর্তেই বলল, "ভাগো ঘোড়ার বাচ্চারা। বাট রিমেম্বার, রাত ন'টার মধ্যে না ফিরলে তোমাদের আমি বেহেস্ত দেখিয়ে দেব। এখন যাও—ভাগো—"

নিঃশব্দে জেটিতে পৌঁছে রুস্তম গাল দিল সাহেবকে, বলল, "শালা

বাঁদরের বাচ্চা—খোদা কসম; শালার মুখে একদিন থুতু ফেলে দেব—”

বন্দর এলাকার পেছনে আছে ছুটো মিষ্টির দোকান ও ছুটো হোটেল। হিন্দু-মুসলিম ছু'রকমের। তার পাশে ছুটো পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। তারপর কিছুটা ফাঁকা জায়গার পরেই হাট এলাকা। কাপড়ের দোকান, মুদিখানা, মনিহারী দোকান, ডাকঘর, রেজিস্ট্রী অফিস, গোলা প্রভৃতিতে জমজমাট।

সাহাবুদ্দীনের হোটেলে ভিড় মন্দ হয় না। সন্ধ্যের সময় আর একটা জাহাজ আসবে বন্দরে। তাই চারপাশের গাঁ থেকে ইতিমধ্যেই নানা লোকেরা এসে হাজির হয়েছে। অধিকাংশই গোয়ালন্দের যাত্রী। খানাপিনার পর্বটাও এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে—সবাই ওসব ঝামেলা আগেই সেরে ফেলতে চাইছে।

রুস্তম সঙ্গীদের নিয়ে সাহাবুদ্দীনের হোটেলে ঢুকল।

বাঁশের তৈরী একটা মাচার ওপর একটা কাঠের ক্যাশ-বাক্স নিয়ে, একগাল পান চিবোতে চিবোতে সাহাবুদ্দীন যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিল। রুস্তমদের দেখে সে আহ্বান জানাল, “আসুন তশ্‌রীফ নিয়ে আসুন ভাইসব”—

“ছালাম ওয়ালেকুম সাব্”—

“ওয়ালেকুম ছালাম—ওয়ালেকুম ছালাম”—

রুস্তম হাসল, “কি খবর মিঞাসাব, ভালো তো?”

সাহাবুদ্দীন চিনতে পারেনি তাদের, চোখ ছুটো ছোট করে সে জেব্রাইলের মত মিষ্টি গলায় বলল, “কিন্তু জনাব—আপনাদের তো আমি—”

রহিম মাথা নাড়ল, “না চেনারই কথা মিঞাজান—সেই তিন মাস আগে একদিন আমাদের জাহাজ ভিড়েছিল—তারপর—”

দাড়ির ডগাতে হাত দিয়ে সাহাবুদ্দীন হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "চিনেছি দোস্ত—বোস, বোস, আরাম কর—"

হঠাৎ কানের কাছে একটা মেয়েলী গলা শুনতে পেল রুস্তম।

"কি খবর সোরাবের বাবা—ভালো আছো তো?"

দ্রুতগতিতে মুখ ফেরাল রুস্তম।

তিন বন্ধু একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

"বাদশা মিঞা!"

"শাহেনশা মিঞা!"

"সেলাম ওয়ালেকুম—"

"ওয়ালেকুম ছালাম"—

"তোমাকেই খুঁজছি মিঞাজান"—

"হ্যাঁ?"

"হ্যাঁ দিলবর"—

"কেন ভাই মুসাফির?"

"লাও লাও বিড়ি খাও একটা?"

সাহাবুদ্দীন ওদের কাণ্ড দেখে হাসে আর দাড়ির ডগায় হাত বুলোয়। বাদশা মিঞাকে ছেঁকে ধরেছে তিন বন্ধু। তিন মাস আগে একদিনের জন্য যে আলাপ হয়েছিল, তা যেন কুড়ি বছরের দোস্তির চেয়েও ঘনিষ্ঠতর ব্যাপার। দেখে বিশ্বাসই হয় না।

আর তিন বন্ধুর মাঝখানে বসে বাদশা মিঞা ফুক্ ফুক্ করে হাসে। ষাট বছরের বুড়ো, কিন্তু সাদা দাড়ি গোঁফকে সে এখনো সযত্নে আঁচড়ে রাখে। রোগা পাতলা মানুষ, চোখ দুটো ছোট ছোট। তালি দেওয়া লুঙ্গি আর ফতুয়া, কাঁধের গামছাটাও ছেঁড়া বটে কিন্তু তা পরিষ্কার, ধবধবে—মিঞার রুচি আছে, কোন শখই জীবনে মেটেনি বলে এখনো পুরো শখ আছে।

বুড়ো বাদ্‌শা যেন রসে টুবুটুবু। পানের ছোপ লাগানো ফোকলা দাঁত মেলে সে সহাস্যে বলল—"বলি ব্যাপার কি, অত খাতির কেন বাচ্চারা?"

রুস্তম বিনীত ভঙ্গীতে বলল, "খাতির পাবার জন্য নানা"—

বাদ্‌শা মিঞা হাসল, "তার মানে?"

"ন্যাকা সেজো না নানা, রাতের বেলা আজ হুরী-পরীদের সঙ্গে মেলমিলাপ করিয়ে দিতে হবে—বুঝেছ?"

"উঁহু। কি বললে? মেলমিলাপ করাব আমি! তাহলে তো কিছুদিন বসে থাকতে হবে তোমাদের"—

"কেন? কেন?"

"আগে বেহেস্তে যাই।"

কেরামৎ মাথা নাড়ল, "ভুল বকছ নানা, তুমি তো বেহেস্তে পা।

রহিম বলল, "তুমি সব পারো মিঞাজান—"

বাদ্‌শা মিঞার সাদা দাড়ির অগ্রভাগ ছুঁয়ে নিজের 'ঠোঁটে লাগাল রুস্তম, চুক্ করে একটা শব্দ করে বলল, "তুমি যাদুকর নানা, আলা-'র চেরাগ আছে তোমার কাছে—"

বাদ্‌শা মিঞা গিরগিটির মত মাথা নাড়তে নাড়তে হাসল, বলল, "তাহলে বলি শোন"—

"হাঁ হাঁ"—

"চাঁদপানা মুখ, মেঘের মত চুল—"

"হায় হায় হায়"

"বাজপাখির ডানার মত ভুরু"—

"ঠিক।"

"আর বেদানার রসে ভেজানো ঠোঁট"—

"বেশখ্"

"বস্‌রাই গুলাপ তার গালে"—

"আ-হা-হা"—

"আর মসুরদানার মত সোনালী তার রঙ"

"মরি হায় হায় হায়"—

বাদ্‌শা মিঞা মাথাটা নামাল, সুর নামিয়ে বলল, "চাই ?"—

রুস্তম উঠে দাঁড়াল, বুড়ো বাদ্‌শা মিঞাকে আবেগের চোটে সে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরল। বুড়ো ভয়ার্ত ইঁদুরের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেঁচাল, হাসিমুখে বলল, "নামাও মিঞা, নামাও, আর মস্করা করো না—তা নইলে তোমার চোদ্দপুরুষকে অপমান করব কিন্তু"—

তিনি বন্ধুর অট্টহাসিতে সাহাবুদ্দীনের হোটেল সরগরম হয়ে উঠল।

সে বলল, "খালি পেটেই এমন জোর হাসি। এক বোতল গেলে হবে কি ?

রুস্তম বুড়ো আঙুল নাচাল ; বলল, "ঘোড়ার আণ্ডা"—

বিকেল পার হ'ল, সন্ধ্যে হ'ল। নারকেল গাছের মাথার উপরে এক ফালি চাঁদ উঠল। সন্ধ্যেবেলায় যাত্রীবাহী স্টীমারটা যথাসময়ে এল গেল। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাকের মাঝে শেয়ালরা প্রহর ঘোষণা করল। রাত হ'ল।

গোয়ালন্দগামী যাত্রীরা এখন আর হোটেলে নেই। জাহাজে থেকে আরো চার পাঁচ জন এসে হাজির হয়েছে এখন, এসেছে গ্রামের যত শয়তানেরা। ছোকরা বুড়ো সবাই। এখন আর শুধু মাছ-মাংস-ভাত কাবাবের কারবার নয়। এখন চলছে দেশী মদ। কাঁচি সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে ঘরটা। তারি মধ্যে গ্যাসবাতির আলোতে

রুস্তমেরা এক কোণে বসে তাসখেলার নাম করে মাংসের হাড় চিবোচ্ছে আর মদ গিলছে। ধীরে ধীরে নেশা তাদের গাঢ় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেসামাল হয়নি রুস্তম আলী। আর সবার অবস্থা টলো-মলো হলেও সে ঠিক আছে, বাদ্‌শা মিঞার জন্য কান আর চোখ পেতে রেখেছে সে দরজার দিকে। বুড়ো এক ঘণ্টার ওপর হ'ল বেরিয়েছে, সব ঠিক করে এসে ডাক দেবে।

রুস্তম একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। রাত হয়ে যাচ্ছে, বেশী রাত হলে মুশকিল হবে। কড়া লোক তাদের কাপ্তেন; একটা বুনো জানোয়ারের মত। রাত বেশী হলে সব পণ্ড হবে।

আর এক কোণে জুয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, রহিম আর কেরামৎ সেখানে গিয়ে হল্লা আরম্ভ করল।

"এই—আমরা খেলব"—

"ফুটা কিসমৎকে মেরাম্মত করব ভাই—হাঁ"—

"লাও রূপেয়া"—

টাকা-পয়সার ঝনৎকার শোনা যায়। রুস্তম বসে বসে অপেক্ষা করে। একটা দাবাগ্নিশিখা যেন সমস্ত দেহমনকে গ্রাস করছে।

হঠাৎ কানের পাশে বাদ্‌শা মিঞার মেয়েলী গলা ধ্বনিত হ'ল। "ওহে জাহাজী মিঞা, একটু বাইরে এসো—জলদি"—

সমস্ত চেতনা যেন হঠাৎ বাঘের মত লোলুপ হয়ে উঠল।

বাদ্‌শা মিঞা যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে চলেছে।

আকাশের এক ফালি চাঁদ এখন ডুব মেরেছে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট ভালো করে চেনা যায় না। হোটেলের পেছনকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে বাদ্‌শা মিঞা। রুস্তম তাকে অনুসরণ করছে।

"আর কতদূর মিঞাজান?"

"ঘাবড়ো না বাবা ইস্টিমার—এই এসে গেল"—

গাঁয়ের একটা পথের ওপর গিয়ে হাজির হ'ল দুজনে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল বাদ্‌শা মিঞা, বলল, "এবার দাঁড়াও"—

রুস্তম দাঁড়াল। বিচিত্র এক উত্তেজনায় তার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। অন্ধকার, নির্জনতা, ঝিঁঝি পোকার অশ্রান্ত ডাক। একটি নারীর জন্য। সে কি রকম দেখতে কে জানে।

বাদ্‌শা মিঞা লঘুকণ্ঠে ডাকল, "ফতিমা—অ ফতিমা"—

অন্ধকারের ভেতরে প্রেতের অস্পষ্ট অবয়বের মত একটি মূর্তিকে দূরে দেখা গেল, ক্রমে তা কাছে এল, প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি নারীমূর্তি।

বাদ্‌শা মিঞা রুস্তমের পিঠে হাত দিল, চাপা-গলায় বলল, "এবার যাও মিঞা—তোমার হুরী এনে দিয়েছি—"

"কোথায় যাব ?"

"কোথায় আবার, ওর বাড়িতে। এই সাপখোপের আড্ডাতে যে নেশা বিগড়ে যাবে"—

"আচ্ছা"—বলেই পকেট থেকে দেশলাইটা বের করল রুস্তম, ফস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে ধরল সেই নারী মূর্তির সামনে।

মুহূর্ত মাত্র। যেন বিদ্যুতের আলোতে একটা অপার্থিব মুখকে দেখল রুস্তম। লম্বাটে গড়ন, ডাগর ডাগর বিষণ্ণ চোখ, রসালো ঠোঁট, লাজনম্র বিচিত্র একটা মাদকতাময় ভঙ্গী। আর মুখটা যেন চেনা-চেনা। কোথায় দেখেছে সে মেয়েটিকে ?

"তাহলে এগোই বুড়ো মিঞা—কি বল ?"

বাদ্‌শা মিঞা তার বাঁ হাতটাকে চেপে ধরল, বলল, 'এগোবে বইকি, কিন্তু আমার মজুরী ?'

"কত ?"

"এক টাকা।"

"বাপ্"—

"মানুষ বাঁচতে চাইলে 'বাপ বাপই' করে।"

"যদি না দিই ?"

কঠিন শোনাল বাদ্শা মিঞার গলা, সে বলল, "আমি যাদুকর, তোমার সামনেকার ঐ হুরী তাহলে হাওয়ায় মিলাবে"—

"নাও, টাকা।"

ক্ষুধার্ত অজগরের মুখের মতো বুড়োর ডান হাতটা রুস্তমের হাত থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে নিল।

রুস্তম বলল, "আর রহিম কেরামতের কি হবে ?"

বাদ্শা মিঞার মেয়েলী গলায় হঠাৎ পুরুষালী কাঠিন্য ধ্বনিত হল। সে বলল, "ওদের জন্য ভেবো না সায়েব, ভুঁখা মেয়েলোকের অভাব নেই দেশে।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। বাঁচবার কোন পথ না দেখে ওদের মধ্যে অনেকেই আজ আব্রু ইজ্জৎকে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়েছে—কিন্তু দিন কি সমান যায় মিঞা ? মানুষের সবটাই তো জানোয়ার নয়"—

"কি সব বলছ শাহেনশা ? তার মানে ?"

"মানুষ সব ভুলতে পারে, কিন্তু টাকার জন্য ইজ্জৎ বিক্রির কথা ভুলতে পারে না। সুতরাং আজ যারা তোমার গরম নিঃশ্বাসের কাছে মাথা নিচু করবে, তারাই আবার একদিন তোমার গলা কাটবে"—

কোমরে গোঁজা ছোরার ওপর হাত রেখে রুস্তম দুলে উঠল, বলল,—"ও নানা—নেশা যে টুটিয়ে দিচ্ছ তুমি। খোদা-কসম—"

"মওজ করো মিঞাসাব—চল্লাম"—ব্যঙ্গের হাসি হেসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাদশা মিঞা।

স্তব্ধতা।

ধীরে ধীরে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল রুস্তম। স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল, রুস্তম গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই দু'পা পেছিয়ে গেল। রুস্তম আবার এগোল, খপ্ করে মেয়েটির একটা হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা এক টানে তাকে বুকের ওপর নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে দু'হাতের প্রবল ধাক্কায় সরিয়ে দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলল, "বাড়ি চলুন মিঞা-সাব—আসুন"—

নরম স্পর্শের চাঞ্চল্যকর অনুভূতিতে কেঁপে উঠল রুস্তম, মাতালের হাসি হেসে বলল, "চল, বিবিজান চল—"

মেয়েটি এগোল, রুস্তম তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। পথের দু'পাশে ঘন গাছপালা। ঝিঁঝি পোকার ডাকে কম্পমান জমাট ও নির্জন অন্ধকার। পায়ের তলায় হিমসিক্ত ভিজে মাটি আর সব কিছু মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ। কোমরে গোঁজা ছোরাটার ওপর রুস্তম আবার হাত দিল। কিছুই বলা যায় না, বিশ্বাস নেই কাউকে, তৈরী হয়ে থাকাই ভাল।

খড়ের চালার বাড়িটা, আশেপাশে দুশো গজের মধ্যে আর কোন বাড়ি নেই। জীর্ণশ্রী। হয়তো আগামী বর্ষাতেই তা ধ্বসে পড়বে। বাইরেটা আগাছার জঞ্জালে ভরাট হয়ে আছে, পেছনে একটি ডোবা, সেখান থেকে পচা পানা ও ঘাসলতার তীব্র গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

শেকলটা বাইরে থেকে তোলা ছিল। মেয়েটি তা খুলল।

তার মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিত হল, "আসুন"—

রুস্তম ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে শোবার একটিমাত্র ঘর। রেড়ির তেলের পিদিমটা মিটমিট করে জ্বলছিল, তেল-সলতের পোড়া দুর্গন্ধ ঘরের মধ্যে থমথম করছিল। রুস্তম চারদিকে তাকাল। নিদারুণ দারিদ্র্যের বীভৎসতা

চারিদিকে নগ্ন হয়ে আছে। ঘরের একপাশে নড়বড়ে তক্তাপোশটার ওপর একটি পাঁচ ছ'বছরের ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাণ্ডুর, বিশীর্ণ তার চেহারা, ভঙ্গিটা ভারি ক্লান্ত।

ঘরে নয়, ভেতরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। রুস্তম গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল।

স্তব্ধতা। রুস্তমের কাছে হঠাৎ যেন সময় ভারী হয়ে উঠল। বাইরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। গ্রামান্ত থেকে ভেসে আসছে একটা কুকুরের চিৎকার। মাঝে মাঝে গাছের ডালে হঠাৎ পাখিরা ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে। রাত। কুহকে ভরা। অচেনা গ্রাম। হাতের মুঠোয় একটি অচেনা নারী। আশ্চর্য ও বিচিত্র একটা অনুভূতি। খারাপ ও রোমাঞ্চকর। কিন্তু উপায় কি? তার শেকড় তো শুকিয়ে গেছে। গোটা অতীতটা তার একদিন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলে ভাসার আগে তা সে জলে ডুবিয়েছে। ঘর নেই, সংসার নেই, তার বুকের ভেতরকার বীণার তারে ঝঙ্কার তোলার মত কোন নারী নেই। তাছাড়া বয়স হয়েছে। মন খারাপ হলেও কথাটা সত্যি। অতএব এই ভাল। জীবনটা তার জাহাজের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নতুন পুরোন বন্দরে এমনিভাবে এক-আধদিন খরচ করেই কিছু আয় করে নেবে সে। বেশী কিছু দরকার নেই। ক'টা দিনই বা? কবরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

কবর! ভারী বিশ্রী লাগে কথাটা ভাবতে। এমন লোভনীয় জীবন ও পৃথিবী তাকে ছেড়ে যেতে হবে একদিন। রুস্তম দুলে উঠল হঠাৎ। কি ভাবছে সে? যা হবার হবে, এখন সে ভাববে কেন? এখন সে আকণ্ঠ তার তৃষ্ণা মিটিয়ে নেবে।

মেয়েটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সে বলল, "কৈ, তুমি মোরে বসন্তে বলছ না?"

মেয়েটি আবার তাকে ছু'হাতে ঠেলে দিল, ছু'পা পিছিয়ে দাওয়ার কোণ থেকে ছেঁড়া মাতুরটা নিয়ে এসে দাওয়ার ওপর বিছিয়ে দিল সে, বলল, "বসেন"—

রুস্তম বসল না, বলল, "পিদিমটা আনো"—

"কেন ?"

"তোমারে দেখব।"

"আমি দেখার মত নই মিঞাসাব।"

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। জ্বালাময়, অথচ শান্ত। নিষ্করুণ অথচ মিষ্টি। আসব-তপ্ত চেতনায় হঠাৎ যেন আগুনের ফুলকি পড়ল। নারীদেহের সান্নিধ্যে হঠাৎ যেন রুস্তম আলীর মাথার ভেতরে একটা প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে এল। নিজেই ঘরের ভেতরে গেল সে, পিদিমটা নিয়ে এসে মেয়েটির মুখের সামনে ধরল।

লম্বাটে গড়ন, ডাগর ডাগর, বিষণ্ণ ছুটি চোখ, রসালো ছুটি ঠোঁট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের বিচিত্র আলো। গায়ে গয়নার বালাই নেই, কেবল ছু'গাছা করে কাঁচের চুড়ি ছু'হাতে। তবু ভারি সুন্দর, ভারি অদ্ভুত।

"তোমার নাম ?"

"ফতেমা।"

"ফতেমা!" পিদিমটা নামিয়ে রেখে হাসল রুস্তম বলল, "ভাল নাম, সুন্দর নাম—তুমি দেখতেও ভালো।"

নড়ল না মেয়েটি, কোনো রেখাই দেখা দিল না তার মুখে। রূপের প্রশস্তিতে মেয়েরা খুশী হয়, কিন্তু কোথায় ? প্রাণহীন, পাথরের মত স্থির হয়ে আছে সে, কাঁচের মত শুধু জ্বলছেই তার চোখ ছুটো—প্রাণের আভাস কোথায় ?

চেনা মুখ। মেয়েটিকে যেন কোথায় দেখেছে রুস্তম। ঘাটে আজ। কিন্তু আর কোথাও কি নয় ? নিজের ভেতরে হাতড়াতে

গিয়ে রুস্তম চমকে উঠল। ফতেমা নয়। অথচ তেরো বছর আগে যেন ফতেমার মতই একটি মেয়ে এসেছিল তার জীবনে। আমিনা। রং, চোখ, মুখ, গড়ন—সবই আমিনার পৃথক ছিল।

তবু ফতেমার একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে আমিনার সঙ্গে। কি যেন হল। স্তিমিত পিদিমের আলোর সামনে যেন রুস্তমের গোটা অতীতটা একটা নিমজ্জিত জাহাজের মত হঠাৎ জলের ভেতর থেকে ভেসে উঠল। সুদূর চট্টগ্রাম। ছোট্ট একটা বাড়ি। বুড়ী মা আর আমিনা। বিঘে পাঁচেক জমি। চাষবাস আর ক্ষেতমজুরী। অভাব, দারিদ্র্য, ব্যাধি আর নগ্নতার মাঝেও ফলত সোনার ফসল। মাটি আর আমিনা। দিন আর রাতের বিচিত্র কাহিনী। কিন্তু হঠাৎ একদিন শয়তানের ছায়ায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হল। যুদ্ধ। আগুন। আগুনের মত বাজার। মা মারা গেল, অভাব এসে তার খোলা হাত মেলে ধরল। মহাজনের কাছে ধার হল। ধার শোধ না করায় নালিশ হল। জমি গেল। যেন অর্ধেকটা জান চলে গেল। তারপর? এল দুর্ভিক্ষ। ঘরে দানা নেই, রুস্তম গেল শহরে। রণদেবতার পায়ের শব্দে পৃথিবী টলোমলো—পরিত্যক্ত শহরে রুস্তম প্রেতের মত ঘুরে বেড়াল বহুদিন। ক্ষুধা। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত ঘুরে বেড়াল সে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন সে এক কনট্রাক্টরের ওখানে চাকরি পেল। খাওয়া-পরা ছাড়া দশ টাকা মাইনে। কয়েকদিন কাজ করে সে আগাম নিল পাঁচ টাকা, পাঠাল গাঁয়ের ঠিকানায়। দশ দিন পরে তা ফিরে এল? আমিনা নেই গাঁয়ে। কোথায় গেল সে? রুস্তম পাগল হয়ে গেল। রাতের বেলা চাকরি ছেড়ে পালাল সে, হেঁটে হেঁটে শেষ রাতে গিয়ে পৌঁছল গাঁয়ে। বাড়িতে গিয়ে আমিনাকে ডাকল সে, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। আকাশে চাঁদ ছিল, তার আলোতে দরজাটা ভেজানোই দেখল সে। সে এগোল।

দা ৩১৭৪

হঠাৎ পচা নরমাংসের বিকট গন্ধে তার দম আটকে এল। নাকে-মুখে কাপড় গুঁজে এগোল সে, দরজাটাকে ঠেলল। ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ হল। ভেতরেও ঢুকল আলো। মেঝের ওপর একজন শুয়ে আছে দেখা গেল। আমিনার সেই পাছা-পাড় ছেঁড়া শাড়িটাই পরনে। কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। শেয়ালে খুবলে খুবলে খেয়েছে তার চোখমুখ, বুক ও উরুদেশকে। চেনা মুশকিল, তবু ভুল হল না। ছেঁড়া শাড়ি, হাতের চুড়ি আর একরাশ কোঁকড়া চুল দেখে ঠিকই বোঝা গেল। শেষরাতের গ্রামকে ভয়ার্ত চিৎকারে চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল রুস্তম। কিন্তু কোন সাড়া পেল না সে। গ্রামের অধিকাংশই পালিয়েছে। প্রেতের মত বাড়িটার বাইরে গিয়ে বসল রুস্তম। পচা মাংসের দুর্গন্ধে একটুও কষ্ট হল না তার। অনেকক্ষণ কাটল। ভোর হল। বাড়ির উঠোন খুঁড়ে সে আমিনার গলিত দেহটাকে কবর দিল, তারপরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কবেকার কথা? তা' প্রায় ছ' বছর হল। ছ' বছর ধরে জাহাজের চাকার সঙ্গে তার জীবনকে জুড়ে দিয়েছে রুস্তম। প্রথমে কষ্ট হত, একা একা থাকত সে। কিন্তু একা থাকতে পেয়ে ভয় হতে লাগল। আমিনার শবের সেই বিকট চেহারাটা যেন তাকে নিরন্তর তাড়না করত। তা থেকে বাঁচবার জন্য হঠাৎ সে অতীতকে একদিন মদ আর মেয়েমানুষ দিয়ে চাপা দিয়ে দিল। যাকগে, চুলোয় যাকগে তার অতীত জীবন—সেকথা ভেবে তার বাকী দিনগুলোকে সে কেন নষ্ট করবে?

কিন্তু আজ আবার মনে পড়ছে। বিকৃত শবদেহটা নয়। প্রণয়মুগ্ধা আমিনার মুখ, কথা, ভঙ্গী। রোমাঞ্চকর রাতের বেলায় দুটি কোমল বাহুর বন্ধন, দুটি স্ফুরিত অধরের আত্মসমর্পণ, দুর্বোধ্য প্রণয়-গুঞ্জনের শব্দ। ফতেমার যেন মিল আছে সেই আমিনার সঙ্গে।

দূর—কি সব ভাবছে সে? নেশাটা জবর হয়েছে। বেশ। এবার একটু ফুর্তি হোক। ফতেমা সুন্দরী।

"ফতেমা"—

জবাব দিলে না ফতেমা।

"এদিকে এসো।"

নড়ল না ফতেমা।

"শুনছ?"

এবার ফতেমার ঠোঁট নড়ল, আগের মতই মৃদুকণ্ঠে সে বললো, "শুনেছি। আমার টাকাটা আগে দিন"—

"বটে! আর যদি না দিই?"

জবাব নেই।

রুস্তম হাসল, হাহা করে হেসে উঠল, বলল, "আচ্ছা বিবি গোসা করো না,—এই নাও কত দেব? এক—আচ্ছা দু' টাকাই লাও"—পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে সে মাদুরের ওপর রাখল, রেখে ফতেমাকে টানতে গেল।

টাকা দুটো তুলে নিয়ে ফতেমা উঠে দাঁড়াল, বলল, "দাঁড়ান আসছি"—

"দেরি করো না বিবি—শালার নেশা বিগড়ে যাচ্ছে ইদিকে"—

ফতেমা ভেতরে গেল।

সময় কাটে। ফতেমা ফেরে না। ব্যাপার কি? রুস্তম উঠল, "কইগো ফতেমা বিবি—কোথায় গেলে তুমি?"

"এই যে"—কঠিন কণ্ঠ ধ্বনিত হল তার পেছনে।

রুস্তম ঘুরে দাঁড়াল। দরজার পাশে একটা দা' নিয়ে ফতেমা দাঁড়িয়ে আছে। তার দু' চোখে আগুন জ্বলছে।

"এ আবার কি খেলা বিবি? এ্যাঁ!"

"এবার তুমি বেরোও মিঞা"—

"বটে! তুমি দেখছি জেনানা গুণ্ডা!" হাহা করে হাসতে লাগল রুস্তম।

"তুমি যাবে কিনা বল মিঞা? নইলে ভালো হবে না"—

মুখে চোখে ভয় টেনে আনল রুস্তম, বলল, "যাব বৈকি বিবি—এই যাচ্ছি"—

দরজার দিকে এগোল রুস্তম, যেতে যেতে হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে যেন ভোজবাজি ঘটল। ফতেমার ওপর লাফিয়ে পড়ল সে। একটা ক্ষীণ আর্তনাদ। নিষ্ঠুর বাঘিনীর প্রাণান্ত প্রয়াস। তবু পারল না ফতেমা। তার হাত থেকে দা'টা কেড়ে নিল রুস্তম, দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

তারপর কোমর থেকে এক হাতে ছোরাটাকে বের করে রুস্তম দাঁত বের করে হাসল, বলল, "এবার ফতেমা বিবি?"

আবার মেয়েটা পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে। একহাতেই তাকে দেহের সঙ্গে মিশিয়ে নিল রুস্তম, মুখটাকে নিয়ে গেল তার মুখের দিকে।

হঠাৎ থামল সে। ফতেমার শরীরটা কাঁপছে, ভয়ঙ্কর কাঁপছে আর তার নিষ্কলঙ্ক দুটো চোখের তারা ভয়ে আর জলে ভরে উঠছে। দেখতে দেখতে সেই জল উপচে পড়ল তার গালে, ঠোঁট দুটো তার কেঁপে উঠল থরথর করে। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ফতেমা।

হয়ত ভান, হয়ত ফাঁকি, মিথ্যে। তবু কেমন যেন লাগে। দৈত্যের মত কঠিন আজকাল রুস্তমের হৃদয়, তবু তা যেন নরম হয়ে এল, সে ফতেমাকে ছেড়ে দিল। মাটির ওপর বসে পড়ল মেয়েটা।

নেশাটা কেটে গেল। বহুদিন এমন ঘটনা ঘটেনি। বহুদিন এমন ছবি দেখেনি রুস্তম, দেখেনি যে তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একটি

যুবতী নারী। বহুদিন বাদে তার হৃদয়টা আজ যেন হঠাৎ হাল্‌কা হয়ে গেল, যেন একটা পাথর সেখান থেকে সরে গেল।

ছোরাটা আবার কোমরে গুঁজল সে, ফতেমার সামনে বসল।

"ফতেমা"—

চোখের জল থামেনি তখনো।

"কাঁদছ কেন তুমি?"

অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল ফতেমা, বলল, "দুঃখে"—

"কি দুঃখ?"

"জীবনে এই প্রথম আজ"—

"সে তো আমার দোষ নয় বিবি"—

"না, দোষ আমার—হাতে একটাও পয়সা সেই—দু'দিন ধরে আমার ছেলেটা না খেয়ে আছে। বাদ্‌শা মিঞার কাছে ধান আনতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম একদিন। মিঞা বলেছিল যে, ধান সম্ভব নয়, [illegible] আমার যৌবন আছে, ইজ্জৎ চলে গেলে আমার ধানের অভাব হবে না। ছেলের কষ্ট দেখে আজ তার কথাই মনে পড়ল, তাই বিকেলে গিয়ে বুড়ো দালালকে বললাম যে আমি তৈরি আছি। তারপর"—

"হুঁ, ছেলে ছাড়া তোমার আর কে আছে?"

"কেউ না"—

"বাপ, ভাই, মরদ?"

"কেউ না।"

"তোমার মরদ কবে মারা গেছে?"

"দু' বছর আগে"—

"কি হয়েছিল তার?"

"কিছু হয়নি,—জমিদার তাকে খুন করেছিল। নিজে নয়, গুণ্ডা দিয়ে।"

"কেন ? কেন ?"

"সে চাষীদের মোড়ল ছিল।"

"এখন তবে চলে কি করে ?"

"এখন আর চলে না।"

"জমি জায়গা ছিল না তোমাদের ?"

"ছিল। কিন্তু দেনা শোধ না করায় মহাজনের কবলে গেছে। ভিটেটা আছে—তাও হয়ত যাবে, মহাজন পেছু লেগেছে।"

"বটে। কিন্তু কেন ? দেনাশোধ হয়নি এখনো ?"

"না"—ফতেমার মুখে হাসি দেখা দিল। বিচিত্র হাসি। সে আবার বলল, "তবে মহাজন আমায় ভিটেটা ছেড়ে দিতে রাজী আছে, আমায় সে পাঁচ দশ টাকা মাসোহারাও দিতে চাইছে"—

"কেন ? দয়া ?"

"না। আমার ইজ্জৎ,—মহাজনের লোভ হয়েছে তার ওপর"—

মহাজন ! মহাজন ! রুস্তমের মাথাটা দপ্ দপ্ করতে লাগল।

সে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "মহাজনের নামটা কি ?"

"তায়েব আলি শেখ"—

"কোন জায়গায় বাড়িটা ?"

"ঐ গঞ্জের কাছাকাছি।"

আরো দুটো টাকা বের করল রুস্তম, মাটির উপর রেখে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমাকে ভয় করোনা ফতেমা বিবি, টাকা কয়টা তুমি লাও, ব্যাটাকে খানাপিনা করাও। জাহাজী মানুষ,—আজ আছি, কাল নেই—কিন্তু এককালে আমারো সব ছিলো। আচ্ছা, আমি আসি,—রাত হয়ে গেছে, নেশাটা কেটে গেছে, আর আমাদের কাপ্তেন

শালা ভারী হারামী।"—অসংলগ্ন কথাগুলোকে শেষ করে রুস্তম ফতেমার দিকে তাকাল।

ফতেমা কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে বসেই রইল, কোন জবাব দিল না। শুধু নিঃশব্দে একবার রুস্তমের দিকে তাকিয়েই মুখটা ফিরিয়ে নিল সে।

পদ্মার ভেতরে যেন ডুবে ছিল সূর্য। অল্প অল্প কুয়াশার আড়ালে, নদীর ওপারে অগ্নিবর্ণ সূর্যকে দেখা গেল, ক্রমে ওপরে উঠল তা, তার রক্তবর্ণ আলোতে পদ্মা মহিমময়ী রূপ ধারণ করল। ভোর হল।

রুস্তমের ঘুম তখন ভাঙবার কথা নয়। ফিরতে তার বেশ রাতই হয়েছিল। জাহাজ কোন বন্দরে ভিড়লেই ঘুমটা বেড়ে যায় তার। আজো সে তাই ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ মিঃ টমাসের গর্জন শোনা গেল, "অ্যাই, মিঞার ব্যাটা—অ্যাই"—

চমকে লাফিয়ে উঠল রুস্তম।

টমাস বুনো শুয়োরের মত গর্জে উঠল, "ক'টায় ফিরেছিলে কাল—ইউ সান অফ্ এ বীচ"—

"এজ্ঞে ঠিক সময়েই তো হুজুর"—

"কি! হোয়াট! মিথ্যে কথা বলছ শালা?"

"এজ্ঞে, "এট্টু দেরি হয়ে গিয়েছিল"—

"বাট হোয়াই—কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে? যত্ত সব ডার্টি প্রফ্লিগেটস্ তোমরা—তোমাদের চাবকানো উচিত।"

তন্দ্রাজড়িত চোখ দুটো মেলে রুস্তম নির্বাক হয়েই রইল। সাহেবের স্বরূপ বেশ ভালভাবেই জানে সে।

"শোন মিঞার পো—আজ তোমার বাইরে যাওয়া বন্ধ, বুঝলে?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর"—

"নাউ গো, ডেক পরিষ্কার করগে তুমি—একা"।

শাস্তি। টমাস সাহেবের এ বিষয়ে ভুল হয় না। রুস্তম উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, "শালা—উল্লুর ব্যাটা উল্লু"—

সাহেব যেতেই আড়াল থেকে এল রহিম আর কেরামৎ। এসে রুস্তমের চারিদিকে একবার নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে নিল, তারপর সমস্বরে বলল, "নাউ গো—ডেক পরিষ্কার করগে"—

বুড়ো সারেঙ এসে দাঁড়াল সেখানে, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে একবার হেসে নিল সে, তারপর, বলল, "তোর আজকে দিন ভালো যাবে রুস্তম—সায়েবের মুখ দেখেছিস তুই"—

রহিম প্রশ্ন করল "বলি, কাল কোন্ আসমানে ছিলে চাঁদ? আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুই শালা একাই ফুর্তি করলি? তুই কিরে?"

দাঁত বের করে রুস্তম বলল, "তোর বুন্থুই"—

কেরামৎ কপট ভঙ্গীতে ধমকে বলল, "নাউ গো ব্লাডি সুইন—দু'কান ধরে উঠবোস কর মিঞা"—

জবাব দিল না রুস্তম। হঠাৎ তার রাতের কথাগুলো মনে হল। কথাগুলো যেন দিনের আলোয় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন সবটাই একটা খেয়াল। কিন্তু আসলে তো তা নয়, মেয়েটির মুখ যে পরিষ্কার মনে পড়ছে! না, স্বপ্ন নয়। যাকে দেখে আমিনার কথা মনে পড়ে যায় তার কথা সে ভোলে কি করে?

হঠাৎ ভোরবেলাকার যাত্রীবাহী জাহাজটাকে উত্তর দিকে দেখতে পাওয়া যায়।

সকাল থেকে আবার সেই একঘেয়ে জীবনের চাকা ঘুরে চলল। শুধু জাহাজটার চাকাই আজ বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু তবু কাজ অনেক। ডেক ধোয়া, পরিষ্কার করা, যন্ত্রপাতিতে তেল দেওয়া, মোছা, রান্নার পালা। সময় কাটতে থাকে।

মাঝে মাঝে টমাসের ক্ষিপ্ত কণ্ঠ শোনা যায়। যেন একটা পাগলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। জাহাজ থামলেই টমাসের মেজাজ ভারী খারাপ হয়ে যায়।

বিস্তীর্ণ পদ্মার ওপারে ধু ধু বনরেখা, বেলা বাড়ার সঙ্গেই তা আরো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাটের দিক থেকে ক্ষীণ কোলাহল ভেসে আসে, ঘাটের বুকে এসে ভেড়ে নানা মহাজনী নৌকা আর জেলেডিঙ্গি। ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদেরা এসে ঘাটে চান করে। হোসেন মিঞা ও মালবাবুর হাঁক ডাক শোনা যায়। পাট মাথায় করে কুলিরা গিয়ে গাধা বোটটাকে বোঝাই করে। কাঁচা পাটের দুর্গন্ধ বাতাসে ভুর ভুর করে। বেলা বাড়ে। রোদের চেহারা কড়া হয়ে ওঠে। হাওয়া বাড়ে, পদ্মার চেহারা পালটে যায়, এস. এস. রত্না দুলতে থাকে আর দুলতে থাকে রুস্তম আলীর মন।

স্নানার্থী নরনারীদের দিকে তাকিয়ে সে কাকে যেন খুঁজল মাঝে মাঝে। না, সে নেই। মাঝে মাঝে রুস্তম আলী অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল। ডাগর ডাগর দুটো চোখ যেন তার চোখের সামনে বারংবার ভেসে যেতে লাগল। যে মুখ দেখে তার কাল আমিনার কথা মনে পড়েছিল। কোথায় গেল তার সেই জীবন? ঘরবাড়ি, বিবি, আর ক্ষেত গিরস্তি? মহাজন! গরিবের একই ইতিহাস। তার জীবন আর ফতেমার জীবন যেন এক। তার গেছে বৌ, ফতেমার গেছে মরদ। একই চক্রান্ত। খোদাহ্‌তালা নন, মানুষই তার পেছনে। চিরকাল তাই হয়ে আসছে।

দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল আসে, রোদের রং হয় কমলালেবুর মত। তখন রুস্তম চঞ্চল হয়ে ওঠে, জাহাজ থেকে নামবার জন্য তার পা দুটো যেন রেসের ঘোড়ার মত উড়ে যেতে চায়। তার ললাটে দেখা দেয় আঁকাবাঁকা নানা রেখা।

সন্ধ্যে হতেই সে রহিমকে গিয়ে ধরল, বলল, "চল্, একটু বেড়িয়ে আসি ইয়ার"—

রহিম হাসল, "আর টমাস ব্যাটার চোখ এড়াবি কি করে?"

"ঠিক বেরিয়ে যাব—খোদা কসম। তুই চল্ না।"

দেড় ঘণ্টা বাদে।

দরজার গোড়ায় রুস্তমকে দেখে ফতেমা চমকে উঠল।

"আপনি!"

"হ্যাঁ—কিন্তু ভয় করো না ফতেমা বিবি, কুমতলব নাই আমার"—

রুস্তমকে দেখে অবাক হয়ে গেল ফতেমা। রুস্তমের চুল উস্ক-খুস্ক, কপালের ডানদিকে একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন, নীচের ঠোঁটটা কেটে ফুলে উঠেছে বাঁ দিকে। ব্যাপার কি?

"আপনার কি হল মিঞাসাব"—

রুস্তম হাসল, "ও কিছু না—একটু মারামারি করে এলাম"—

"কোথায়?"

"ঐ যে—কি যেন নাম তার? হ্যাঁ হ্যাঁ—তায়েব আলি শেখ"—

ফতেমার চোখের তারা ছুটো যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠলো, সে জিজ্ঞেস করল, "কেন? তায়েব আলির সঙ্গে মারামারি করলেন কেন?"

"এমনি—জোতদার মহাজনদের ওপর আমার ভারি রাগ। তা ছাড়া তোমার জীবনকে তো সেই শালাই আজ বরবাদির পথে নিয়ে এসেছে—শালা কুত্তার বাচ্চা। কিন্তু কৈ বিবি, আজো তো বসতে বললে না আমাকে?"

বিষণ্ণ হাসি হাসল ফতেমা, আহ্বান জানিয়ে বলল, "আসুন, বসুন"—

"তোমার ডর হচ্ছে না তো?"

"আপনিই তো ডরাতে না করলেন?"

রুস্তম হেসে ঘরের ভেতর ঢুকল। ফতেমার ছেলেটা তক্তাপোশের ওপর বসে ভাঙা একটা স্লেটের ওপর কি সব যেন লিখছিল, অপরিচিত মানুষ দেখে সে হাত গুটিয়ে বসল।

রুস্তম তার কাছে গেল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "খোকা, তোমার নাম কি বলত?"

ছেলেটি জবাব দিল, "আকবর আলি"—

"বটে! তোমার নামটি তো বেশ খোকা!"

স্তব্ধতা।

ফতেমা বলল, "আপনার খুব চোট লেগেছে দেখছি—দাঁড়ান"—

কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো জলে ভিজিয়ে নিয়ে ফতেমা ফিরে এল, বলল, "দেখি, আপনার ঘা'টা একটু মুছে দিই"—

চোখ বুজে সেই সেবাটুকুকে গ্রহণ করল রুস্তম, তারপর চোখ মেলে বলল, "আমার জিন্দ্‌গীও তোমারই মত ফতেমা বিবি।"

ফতেমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল, প্রশ্ন করল, "কেন?"

"খুব মিল আছে তোমার সঙ্গে আমার। আজ আমি জাহাজে কাজ করি বটে, কিন্তু এককালে আমারও ক্ষেত গিরস্তি আর ঘরসংসার ছিল। গেছে—এখন সব গেছে। তোমার মরদ খুন হয়েছে—আমার বিবি শেয়াল কুকুরের খাবার হয়েছে"—

ফতেমা দু'পা এগিয়ে এল কাছে, রুস্তমের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল, "কেন?"

"দুর্ভিক্ষ।"

বিশ্রী একটা নিঃস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। পীড়াদায়ক, থমথমে। ছেলেটা তক্তাপোশ থেকে নেমে এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। রুস্তম তাকাল তাদের দিকে। বাইরে ঝিঁঝি পোকারা

ডাকতে শুরু করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় চারপাশের জঙ্গলে মর্মর ধ্বনি উঠেছে। ছোট্ট একটা ঘর, একটা মাটির পিদিম, স্তিমিত আলো, গোবর-নিকানো মসৃণ মেঝে, মাটির গন্ধ, একটি নারী, একটি শিশু— লোভ হয়, উদগ্র কামনায় বুকটা আকুল হয়ে ওঠে, একটা নিমজ্জিত জাহাজের মত তার সমস্ত অতীতটা যেন হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছ' বছর কেটে গেছে। ছ' বছরে জীবনটা হয়ে গেছে বেপরোয়া, বেহিসেবী ও উচ্ছৃঙ্খল। হারানো জীবনের রিক্ততাকে সে মদ, মেয়েমানুষ আর হল্লা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেয়েছে এতদিন। কিন্তু আজ হঠাৎ লোভ হচ্ছে। আবার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় লাঙ্গলের ফলার ঘায়ে মাটির বুকে সোনা ফলাতে।

"ফতেমা বিবি"—

ফতেমা তাকাল।

"তুমি নিকে করনা কেন? এমনি একা একা আর কতদিন লড়াই করবে?"

"কতদিন? জানি না। আর কে আমাকে নিকে করবে? গাঁয়ের সবার অবস্থাই খারাপ, সবাই চায় একদিনের জন্য আমাকে, একটা রাতের জন্য। আজো তো মহাজন এসেছিল দুপুরে—শাসিয়ে গেছে যে আর সাতদিনের মধ্যে তার চাহিদা না মেটালে আমাদের ভিটে ছাড়তে হবে"—

"ফতেমা বিবি"—

"বলেন।"

"নিকে করার লোকের কমি নাই দুনিয়াতে।"

স্তব্ধতা।

রুস্তম উঠে দাঁড়াল, একটু থেমে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বিবিসায়েব, আমি কি খুব খারাপ লোক?"

ফতেমা হাসল, রুস্তমের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি করে বলব তা একদিনে?"

"হুঁ—আচ্ছা আসি।"

দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুস্তম। যেন সে পালাল।

বাইরে গিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল রুস্তম। কিসব ছাই ভস্ম বলে এল সে? জাহাজের খালাসী সে, জাহাজই তার ঘর, নদীই তার পৃথিবী। সেখানে ঘরসংসার আর ক্ষেত গিরস্তির কথা সে ভাবে কি করে?

আরো আধ ঘণ্টা বাদে।

দারোগা সাহেব বিদায় সম্ভাষণ জানাল। মিঃ টমাস বলল, "গুড্ নাইট ইনস্‌পেক্টর সাহেব—ডোণ্ট ওরি, আই শ্যাল গিভ্ দেম এ গুড লেসন্—রাস্কেলদের আমি বরখাস্ত করব এই ট্রিপের পর"—

দারোগা সাহেব মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, তা যেন হয়। আমি শুধু আপনার খাতিরেই ব্যাটাদের ছেড়ে দিলাম—গণ্যমান্য একজন জোতদারকে ধরে এমন মার দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। রীতিমত খুন করার চেষ্টা, মোকদ্দমা হলে দু'তিন বছরের জেল হয়ে যেত।"

টমাস বিনীত কণ্ঠে বলল, "ধন্যবাদ দারোগা সাহেব—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম"—

"গুড্ নাইট"—

দারোগাসাহেব ও কনেস্টবলেরা চলে গেল। টমাসের মুখ চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, সোজা সে নীচের তলায় গিয়ে হাজির হল।

"কোথায়? সেই রাস্কেল কোথায়?" টমাসের গর্জনে সবাই চমকে উঠল।

"হোয়্যার ইজ দ্যাট ডগ্? রুস্তম আলী?"

মিনিট পাঁচেকও হয়নি রুস্তম ফিরে এসেছে। এসেই সে সব

শুনেছে। তায়েব আলির নালিশে ও ঘুষের মহিমায় পুলিশ এসেছে তাকে জাহাজ থেকে ধরে নিয়ে যেতে। উত্তেজিত খালাসীরা তখন তাকে ও রহিমকে গালিগালাজ করছিল। ঠিক এমনি সময় টমাসের গর্জন শোনা গেল।

"রুস্তম আলী"—

ধীরে ধীরে রুস্তম এসে টমাসের সামনে দাঁড়াল। কপালে ও ঠোঁটে তার মারামারির পরিষ্কার চিহ্ন, সুতরাং অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। মুখ বুজেই রইল।

"এই যে গুণ্ডা বদমাশ উল্লু,—কিন্তু কেন? মারামারি করেছিলে কেন?"

"মহাজন আমাকে গাল দিছিল হুজুর"—

"শালা মিথ্যুক কোথাকার"—

"এজ্ঞে না হুজুর"—

"কিন্তু এমনি এমনিই কি গাল দিতে পারে মানুষ?"

"তাই ত দিছিল হুজুর"—

"হুঁ—আর তোমার সঙ্গে কে ছিল?"

"কেউ না হুজুর, গাঁয়ের লোক",—

"ঠিক করে বল—কে ছিল"—

"কেউ না হুজুর"—

টমাস হাসল দাঁত বের করে, বলল, "শালা, এক নম্বরের শয়তান তুমি—কিন্তু শোন, আবার কোনদিন যদি এমনি কাণ্ড ঘটে, তাহলে তোমাকে আমি লাথি মেরে তাড়াব—আই শ্যাল কিক্ ইউ আউট"—

টমাস পা বাড়াল, কিন্তু দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, "লিসন্, কান পেতে শোন তোমরা—পাট বোঝাই শেষ হয়ে গেছে, আসছে কাল সকাল দশটায় জাহাজ ছাড়বে।"

ভোর হতেই জাহাজে ব্যস্ততা দেখা দিল। সাতটা নাগাদ ঝকঝক করতে লাগল জাহাজটা। রুস্তম ও রহিম বয়লারে কয়লা দিতে লাগল। আর সব ঠিকঠাক।

হোসেন মিঞা আর মালবাবু ব্যস্ত। সকালের যাত্রীবাহী জাহাজটা এল, গেল। তারপরে তিনহাজার মণ পাটের রসিদপত্তরও সই করা হল। ঘড়ির কাঁটা সাত থেকে আটে, আট থেকে ন'য়ে পোঁছোল।

নদীর ওপারের ধু ধু বনরেখা এখন একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আকাশটা ভারী নীল। ঘাটের ওপরে কয়েকটা গাঙচিল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুলিরা চেঁচাচ্ছে, মহাজনী নৌকো আর জেলেডিঙির মাঝিদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে পদ্মার মৃদু কল্লোলধ্বনি।

ডাগর ডাগর দু'টি চোখ, লম্বাটে গড়ন, দু'টি বিষণ্ণ চোখ, রসালো ঠোঁট, কচি পাতার মত আশ্চর্য দেহবর্ণ। রুস্তম ভাবে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায় সে। আমিনার মত মেয়েটি। আমিনা নেই, ঘরগিরস্তি নেই, সুখশান্তি নেই। কবরের তলায় আমিনার পচা, গলা, শেয়ালে-খাওয়া দেহটা হয়ত চাপা পড়েছে, আমিনা তো চাপা পড়েনি। সে বেঁচে আছে। তার স্মৃতিতে। সব মেয়েদের চোখের চাউনি আর হাসির মধ্যে। নরম স্পর্শ আর ভালোবাসার মধ্যে। রুস্তম হাসল। উপায় নেই। প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে তার বন্দর ডুবে গেছে।

ঘাটের এক পাশে স্নানার্থী নরনারীরা ভিড় করছে। বাচ্চাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। ভাল করে তাকাল রুস্তম। না, সেই মুখটি কোথাও নেই। মনটা দমে যায়, মেয়েটাকে দেখতে পেলে মন্দ হত না।

টমাসের চিৎকার ভেসে এল, "এই সারেঙ্—কোথায় তুমি? অ্যাঁ? বুড়ো হাব্ড়াদের নিয়ে আর কোন কাজ চলবে না দেখছি"—

রহিম ওপাশে গুন্‌গুন্‌ করে গান ধরেছে একটা ঃ

"ও গুনো বিবি গো, পায়ে না ঠেইলো গো
আমি যে দিছি তোমায় পরাণ"—

রুস্তম হাসল। বেশ গায় রহিম!

জাহাজের প্রথম ভেঁপুটা বেজে উঠল। বেশ লম্বা একটা ডাক। এস. এস. রত্না যেন মীরপুর বন্দরের সবাইকে তার বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

"হো-ই-ই-ই—রশি ফ্যাকো জী-ই-ই"—

গাধাবোটটাকে জুড়ে দেওয়া হল জাহাজের সঙ্গে। কাঁচা পাটের দুর্গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করতে লাগল। ইঞ্জিনটা এতক্ষণে প্রাণ পেয়েছে, বাষ্পের ছটফটানি সমস্ত জাহাজটার গায়ে ধমনীর স্পন্দনের মত ছড়িয়ে পড়ছে আর ক্ষীণ একটা একটানা শব্দ উঠছে পোঁ-ও ও-ও-ও—।

মীরপুর বন্দরে এবার নানা কাণ্ড ঘটল তার জীবনে। রুস্তম ভাবে। পরশু দিনকার রাত, কালকের রাত। তার জীবন আর মেয়েটির জীবন যেন এক। তারা দুজনেই যেন ভাঙ্গা জাহাজ। কিন্তু লোক কি নেই? বিরাট বিস্তৃত জলরাশির ওপর দিয়ে ঝড়বৃষ্টি আর বিপদ-আপদ ঠেলে এগোবার রোমাঞ্চকর বাসনা কি কখনো মরে যায়?

"হো-ই-ই-ই—ঘন্টি মারোজী"—

মেশিন চলতে শুরু করল। দ্বিতীয়বার ভেঁপু বাজল জাহাজের।

হোসেন মিঞা আর মালবাবু এল কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করতে।

"গুড-বাই কাপ্তেন সাহেব, আবার আসবেন—মুরগী এ্যাণ্ড ফিশ্‌ ভেরী সস্তা হিয়ার"—

মিঃ টমাসের স্নায়ুতে তখন জাহাজের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছে, তার মন তখন পাখা মেলেছে দিগন্তের দিকে। মামুলী হেসে সে বলল, "ইয়েস—ইয়েস, গুড-বাই মিঞা সাব্‌"—

রুস্তম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে চারদিকে। না, ঘাটের কোথাও সেই ডাগর ডাগর চোখ দু'টি নেই।

হোসেন মিঞা ও মালবাবু চলে গেল।

হঠাৎ টমাসের নজর পড়ল রুস্তমের ওপর, খেঁকিয়ে উঠল সে, "কি মিঞার পো—চুপ করে দাঁড়িয়ে যে—গতরে কি ঘুন ধরল নাকি? যাও যাও, কাজে যাও"—

রুস্তম সরে গেল সেখান থেকে।

"হো-ই-ই-ই—টানো জী"—নোঙরটা উঠে এল পদ্মার বুক থেকে। পণ্টুনটাকে টেনে সরিয়ে নিতে লাগল বন্দরের কুলিরা।

আর একটা ভেঁপুর আওয়াজ।

জাহাজের চাকা পদ্মার জলকে আবর্তিত করল, জাহাজটা দুলে উঠল, তারপর তীর থেকে দূরে, আরো দূরে সরে আসতে লাগল।

নীচের তলায় নেমে গেল রুস্তম, জাহাজের পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। মীরপুর বন্দর পেছিয়ে যাচ্ছে ক্রমেই। আবার শুধু জল, মাঝে মাঝে সরাইখানার মত এক আধটা বন্দর, পয়সা দিয়ে কেনা মদ আর মেয়েমানুষ দিয়ে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া। না, কোন আশা নেই। ঘর, বাড়ি, বিবি, বাচ্ছা, জমি আর হাল বলদ—রুস্তমের জীবনে আর ওসবের জায়গা নেই।

নেই? তাই কি?

হঠাৎ গাধাবোটের সঙ্গে বাঁধা দড়িটাতে ঝুলে পড়ল রুস্তম। শূন্যে শূন্যে ঝুলেই সে গাধাবোটে পা দিল। লুকিয়ে লুকিয়ে গাধাবোটের পেছনে গিয়ে হাজির হল সে, তারপর সেখান থেকে একটি লাফ দিল জলের ওপর।

জাহাজের চাকার ঘায়ে আবর্তিত, মথিত জলরাশিতে প্রথমটা পাক খেয়ে ডুবে গেল রুস্তম। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার,

পরমুহূর্তেই সে ভেসে উঠল, তাকিয়ে দেখল যে এস. এস. রত্না কালো ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চলে যাচ্ছে। রুস্তম হাসল, নিশ্চিন্ত হ'ল, কেউ তাকে দেখতে পায়নি। তার ছ'বছরের শূন্য জীবন ঐ জাহাজের সঙ্গে ভেসে চলে গেল।

দৈত্যের মত পেশল দুটো বাহু দিয়ে সে জল কেটে এগিয়ে চলল। মাটির দিকে। আর জলে জলে ভেসে বেড়াবে না সে।

নীচু হয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কামিনী উঠে দাঁড়াল, তারপর দুহাত তুলে পিঠের ওপর ছড়ানো চুলের রাশি জড় করে খোঁপা বাঁধতে লাগল

তন্বী, শ্যামা কামিনী, মসৃণ একটি শ্যামশোভায় ঝলমল করছে তার সর্বাঙ্গ। নাক চোখ মুখ তার নিখুঁত নয় কিন্তু তার যৌবন নিখুঁত—সবচেয়ে আশ্চর্য তার দুটি চোখের ঘন কালো রং আর সেই কালো চোখের মণি দুটোতে যেন কোন ধারালো অস্ত্রের দীপ্তি।

বাঁধা তবলা সামনে রেখে বিনায়ক মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। এই দেখা তার নতুন নয়, তবু প্রতিদিনকার মত আজো নতুন বলে মনে হচ্ছে। রোজ যেন কামিনীকে সে তিল তিল করে আবিষ্কার করছে, রোজই কামিনী যেন একটু একটু করে তিলোত্তমা হয়ে উঠছে।

তার সেই মুগ্ধতাকে লক্ষ্য করে কামিনীর চোখের মণিদুটো আরো চঞ্চল হয়ে উঠল, মুচকি হেসে বলল, "অমন করে দেখছ কি?"

"দেখছি একজনকে—"

"কে?"

"আমার প্রেয়সীকে।"

"তাই বলে অমন হাঁ করে?"

"উপায় কি—দেখলেই যে নেশা ধরে যায়—নেশায় কি মানুষের হুঁশ থাকে?"

"এখনো নেশা ধরে—এই পাঁচ বছর বাদেও?" কামিনীর চোখ—তির্যক হয়ে উঠল।

তার সেই পুরনো প্রশান্ত হাসি হাসল বিনায়ক, বলল, "পাঁচ বছরে নেশা আরো গাঢ় হয়েছে।"

"ঘটে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

স্ত্রীর দিকে আগের মতই তাকিয়ে রইল বিনায়ক—স্বামীর সেই মুগ্ধ অচঞ্চল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিজের চঞ্চল চাউনিকে একটু স্থির করার চেষ্টা করে মিটিমিটি হাসতে লাগল কামিনী। একতলা প্যাটেল চত্তলের পূবকোণার এই ছোট্ট ঘরটাতে ক্রমে মুগ্ধ স্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠতে লাগল। চিঞ্চোলীর দিক থেকে ভেসে আসা মেঘজালে বাঁধা দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছিল, রবিবারের ছুটি তখন বিকেল-শেষের উদাস হাওয়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল।

হঠাৎ নড়ে উঠল কামিনী, সমস্ত শরীরে একটা ছন্দের হিল্লোল বইয়ে সে বলল, "এবার বাজাও দেখি—"

স্তব্ধতা ভেঙে আচমকা তবলার বোল শোনা গেল। যেন গাছের ডাল থেকে হঠাৎ একদল পাখি কলরব করে উঠল, বাঁধনছেঁড়া এক শব্দের হরিণ যেন হঠাৎ শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল। আর তবলার সেই বোলের সঙ্গে ঘুঙুরের বোল সুর মেলাল।

ভরত-নাট্যম্। কোল্‌হাপুরে শিখেছিল কামিনী। বিনায়ক তখন সবে বম্বে থেকে একটা ক্লথ মিলের স্ট্রাইকের ব্যাপারে এক বছর জেল খেটে ফিরে এসেছে। কোল্‌হাপুরে মাসি থাকত, নতুন করে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার আগে ক'টা দিন সে জিরোতে এসেছিল। সেখানে বন্ধু পুসলকরের বাড়িতে গৌরীপুজোর জলসাতেই কামিনীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ নয়, আবিষ্কার। পুসলকর পরিচয় করিয়ে দেবার পর ছেলেমেয়েদের নাচগান আরম্ভ হল। শেষে নাচে দাঁড়াল কামিনী—গানে দাঁড়াতে বাধ্য হল। কিন্তু মুশকিল হল একটা। তবলা বাজাবে কে?

পসলকর বলল "বিনায়ক।"

বিনায়ক বলল, "জেলখানায় গিয়ে ভুলে গেছি ওসব।"

পুসলকর বলল, "তব্‌লার সামনে একবার বোস্‌ তো, তারপর দেখব ভুলেছিস কিনা।"

বাজাতে হয়েছিল। প্রথমে হাত খুলছিল না, কিন্তু কামিনীর নাচের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা হঠাৎ বিনায়কের জড়ত্বকে শুকনো পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নাচ সে বোঝে না, মুদ্রার অর্থ তার কাছে অজানা, কিন্তু কঠিন ও কোমল দেহবল্লরীর গতি-ভঙ্গিমা যখন তালের সঙ্গে মিশে এক দৃশ্যমান ছন্দ সৃষ্টি করতে লাগল তখন সে যেন নেশাগ্রস্তের মত বাজাতে লাগল। সেই বাজনা শুনে কামিনীরও যেন নেশা জন্মাল, আর দুজনের নেশা এক হয়েই পরে অনুরাগের সৃষ্টি করল।

পূর্বরাগের পালা মাস কয়েক চলেছিল। তারপর বম্বেতে চাকরি পেল বিনায়ক—প্লাস্টিক কোম্পানিতে মাস গেলে একশ' টাকা। সেই চাকরি পেয়েই হিসেব করতে বসল বিনায়ক। দারিদ্র্য, স্বদেশ-সেবা, শ্রমিক-আন্দোলন, দু'বার জেলভোগ—সব কিছুর ভেতর দিয়ে তার বত্রিশ বছর কেটে গেছে। ছোটবেলা থেকে সে নীতিবাক্যে বিশ্বাস করেছে, জীবনে তা বর্ণে বর্ণে পালন করেছে। আজো সেই পথে আছে বলে সে বুঝতে পারছে যে, তার থার্ড ক্লাসের বিদ্যে দিয়ে সে আর বেশী কিছু করতে পারবে না। সে যা জানে তা দিয়ে একশ' দেড়শ'র বেশি রোজগার হবে না। গুণের মধ্যে তবলা বাজানো কিন্তু তা দিয়ে সে রোজগার করবে না কারণ শিল্পীর জীবন অনিশ্চিত। তার সব চেয়ে বড় গুণ যে অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ সমাজে তার দাম নেই। অথচ যৌবন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। দরিদ্র ভারতবাসীর আয়ুর অঙ্ক তার জানা আছে বলে বিনায়ক হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। নগ্নতা, উপবাস, আর ব্যাধির ভয়কেও অগ্রাহ্য করে সে বিয়ে করার বিষয়ে

নিষ্পত্তি করে ফেলল। কোল্‌হাপুরের থেকে কামিনী তার গরীব বিধবা মায়ের সঙ্গে এল, ক'দিন বাদেই বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর প্যাটেল চত্তলের ছোট্ট একটি ঘর আর তার ভগ্নাংশ একটি রান্নাঘরে তাদের দ্বৈত জীবনের সঙ্গীত আর সঙ্গত শুরু হল। রোজ ভোর-সকালে উঠে কামিনী রাঁধতে বসে। বিনায়ক উঠে কফির পেয়ালা নিয়ে চার পয়সা দামের মারাঠী খবরের কাগজটা পড়ে। তারপর সে স্নান করে খায়, খেয়ে উঠে খাকি ট্রাউজার আর লংক্লথের শার্টটা পরে, কোল্‌হাপুরী চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে নেয়। ছোট্ট একটা নিকেল করা ডিবের ভেতর জলখাবার ভরে খবরের কাগজ আর তিলক লাইব্রেরি থেকে আনা বইটা তার ফুলতোলা থলিতে ভরে সে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। অদ্ভুত এক চাহনি দেখা দেয় তখন বিনায়কের চোখে, প্রশান্ত একটা হাসি খেলে তার ঠোঁটের কোণে। তারপর সে চলে যায়।

একা একা দিন কাটে কামিনীর। প্যাটেল চত্তলের এঘরে ওঘরে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় সে। নায়েকের ঘরে কোথায় কি আছে, ছবিলদাসের ঘরের কোথায় ছুঁচ-সূতো থাকে, মীরচান্দানীদের আলমারির কোথায় উইপোকা বাসা বেঁধেছে—সব কিছু জানা হয়ে যায় তার। শুয়ে, বসে, গল্প করে, গল্পের বই পড়ে, দিবাস্বপ্ন দেখে দিন শেষ হয়। সমুদ্রের দিক থেকে জোলো হাওয়া আসে ঘরের ভেতর, বিষণ্ণ আধো-আলো আধো-অন্ধকার গোধূলি বেলায় যখন মনের তার থরথর কাঁপতে থাকে, তখন সেই ফুলতোলা কাপড়ের থলিটি হাতে বিনায়ক ফিরে আসে। কাঁপুনিটা থেমে যায়।

আবার রান্না, খাওয়া, এলোমেলো গল্প, ঘুম। মাঝে মাঝে বিনায়ক তবলা নিয়ে বসে, রেওয়াজ করে—সেই সঙ্গে কামিনী নাচে। প্রথম প্রথম চত্তলের অন্যান্য বাসিন্দারা উঁকিঝুঁকি মারত, কিন্তু কামিনী

তারপর থেকে দরজা জানালা বন্ধ করে নাচত। সারাদিন ধরে যে অব্যক্ত বেদনা একাকিত্বের চাপে জমা হয়ে উঠত তা নাচের সময় ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যেত।

কিন্তু কিছুদিন পর থেকে ধোঁয়া দাগ রেখে মেলাতে লাগল। দিনের পর দিন্ এমনি কাটবে? যখন সে নাচ শিখত, যখন সে কোল্হাপুরের পরিচিত গণ্ডীতে নাচ দেখাত এখানে ওখানে, তখন সবাই কত প্রশংসা করত! কত লোক তার রূপ আর গুণের প্রশংসা করে বলেছে যে সিনেমাতে গেলে তাকে সবাই লুফে নেবে। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে সে বরাবর এই ছবিই দেখেছে যে সবাই তাকে দেখে মুগ্ধ, সবাই তার নাচ দেখে হাততালি দিচ্ছে, রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে গেলে সবাই কানাকানি করছে, "কামিনী—ওই সেই বিখ্যাত কামিনী"—কিন্তু আজ তা ভাবতে গেলে চোখে জ্বালা ধরে কেন?

বিনায়ক সেটা টের পায় কি পায় না বোঝা যায় না—একইরকম প্রশান্ত থাকে সে; একই রকম স্থির, ধীর, স্বল্পবাক। দিন আর রাতের প্রহরগুলোকে সে যেন সারাজীবনের জন্য হিসেব করে ঠিক করে নিয়েছে। ঘুম ভাঙার পর থেকে আবার ঘুমোন পর্যন্ত নির্ভুল তার হিসেব। কিন্তু তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে সে কামিনীর দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি মেলে তাকায়, মাঝে মাঝে হঠাৎ কামিনীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়, বেড়াতে যায় চৌপাটি আর ক্যানারি ভেঙে, মালাবার পাহাড়ে আর মার্ভের নির্জন বেলাভূমিতে। কিন্তু তাও যেন হিসেব-করা জীবনের হিসেব-করা বাজে খরচ। কামিনীর শুধু পা বেদনাই সার হয়, চিত্তের কোন শান্তি হয় না।

শুধু ভালো লাগে মাঝে মাঝে সিনেমায় গেলে। মাসে দু'মাসে একবারের বেশি তা কুলোয় না। কিন্তু সেই সময়টাতেই কামিনী বাঁচে, অন্ধকারে আলোকিত পর্দার জীবনে সে মিশে যায়, ভুলে যায়

যে পাশে তার স্বামী বসে আছে। তারপর সিনেমা যখন শেষ হয়ে যায়, ফুলতোলা থলিটা হাতে বিনায়ক যখন কামিনীর হাত ধরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশংসামুখর ঘরমুখো দর্শকদের মন্তব্যগুলো কামিনীর কানে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চলতে চলতে সে ভাবে যদি সে নাট্যকলার চর্চা করতে পারত, তাহলে হয়ত তার বিষয়েও লোকেরা এমনি চর্চা করত!

উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই কীট যখন মনের অন্ধকূপে চাপা ছিল, ঠিক তখনই এল বিনায়কের বন্ধু পাণ্ডুরঙ্গ।

ছিমছাম, ফিটফাট, কথাবার্তায় চৌকস লোক পাণ্ডুরঙ্গ। বিনায়কের বাল্যবন্ধু সে, বয়সে সে দু'তিন বছরের ছোট। অনেকদিন দেখা হয়নি দু' বন্ধুতে, প্রায় ছ'বছর বাদে আবার দেখা হল। দেখা হতেই বিনায়ক তার বন্ধুকে সোজা পাটেল চত্তলে টেনে নিয়ে এল।

"কামিনী—এই আমার বাল্যবন্ধু, পাণ্ডুরঙ্গ—রজত ফিল্মস্ এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রোডাকসান ম্যানেজার—"

ফিল্ম! সিনেমা! নতুন করে আবার পাণ্ডুরঙ্গের দিকে তাকাল কামিনী।

পাণ্ডুরঙ্গ হাত জোড় করে সহাস্যে বলল, "জেল-ফেরত দাগী আসামীটা যে আপনার মত চারুদর্শন একটি স্ত্রীরত্নকে এনে গৃহলক্ষ্মী করবে একথাটা আগে জানা থাকলে বিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগটা আমার বন্ধ হত না—"

বিনায়ক মৃদু হেসে বলল, "তোরা সিনেমার লোকগুলো একটু বেশী কথা বলিস, আর টকি হওয়ার পর থেকে তো সবাই একেবারে ছবির সংলাপ আওড়াস—"

"হবেই"—পাণ্ডুরঙ্গ চটপট জবাব দিল, "কারণ এটা আমার মতে অ্যাটম-যুগ নয়, সিনেমা-যুগ—

বিনায়ক মাথা নেড়ে বললে, "একথাটা ঠিক বলেছিস, সিনেমা যে কী বস্তু তা তোকে দেখেই টের পাচ্ছি—"

"কেন ?"

"তা নয়ত কি ? ছিলি ঘোর স্বদেশী, ঘোর নীতিবাগীশ"—

ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখদুটি পিট-পিট করে পাণ্ডুরঙ্গ হাসল, বলল, "হয়েছি ঘোর চালিয়াৎ, ঘোর উচ্ছৃঙ্খল—"

"ঠিক—কিন্তু কেন পাণ্ডুরঙ্গ ?"

'কারণ এই সিনেমা-যুগটা চরিত্রহীনতারও যুগ—"

"ঠাট্টা রাখ—বোস, বসে সব খুলে বল। কামিনী দু'পেয়ালা—"

পাণ্ডুরঙ্গ কামিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "চা আর তার সঙ্গে গাঠিয়া ভাজা বা বটোটা বড়া একটা কিছু চাই—আমার কিন্তু ভারি খিদে পেয়েছে বৌদি—"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—" কামিনী খুশী মনে তাদের দ্বিতীয় এবং শেষ কামরা, মানে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু তার কান রইল দু'বন্ধুর কথাবার্তার দিকে। পাণ্ডুরঙ্গ তখন নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করেছে। স্টোভটা ধরিয়ে জল চাপিয়ে দিল কামিনী, তারপর দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। পাণ্ডুরঙ্গ তখন বলতে শুরু করেছে।—'বাপ মারা যাবার পর স্বদেশী নেশাটা যখন সংসারের চাপে ফিকে হয়ে এল, তখন থেকে জীবনের স্রোতে ভাসতে আরম্ভ করল সে। ইনসিওরেন্সের দালাল, এখানে সেখানে অস্থায়ী চাকরি, গ্রীষ্মকালে লস্যির দোকানদার, সিল্ক মিলের কেরানী, বাড়ির দালাল, তারপর সিনেমা হাউসের গেট-কীপার। সেখান থেকেই হঠাৎ নেশাটা গাঢ় হল আবার—স্বদেশীর নেশার বদলে সিনেমার নেশা। সিনেমার জগৎ তাকে বার-বার

হাতছানি দিতে লাগল আর কানের পাশে ধ্বনিত হল লাখ লাখ টাকার মধুর নিক্কণ। পরিবর্তনশীল জগতে এই অস্থায়ী জীবনও বারবার বদলায়—পাণ্ডুরঙ্গও বদলাল। এখন সে রজত ফিল্মসের প্রোডাকশান অ্যাসিস্ট্যান্ট—আসলে সে-ই সব। প্রডাকশান ম্যানেজার তো তাকে ছাড়া এক পা-ও চলে না। প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টারও তার কথা অমান্য করতে পারে না। দিগ্বিজয়ী শিবাজীর দেশবাসী সে—রজত ফিল্মসের সবাইকে জয় করেছে, বশ করেছে।

কামিনী মনে মনে পাণ্ডুরঙ্গের বিষয়ে শ্রদ্ধাবোধ না করে পারল না। প্যাটেল চত্তলের পূবকোণার ছোট্ট ঘরটা পাণ্ডুরঙ্গের কথা আর হাসিতে গমগম করতে লাগল, অভিনেতাদের মত হাত পা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, লেখকের মত সাজানো গোছানো চোখাচোখা কথা বলে পাণ্ডুরঙ্গ আবহাওয়াটা বদলে দিল। বিনায়ক চুপ করে বসে শুনতে লাগল তা, আর মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে সে আসতে লাগল। একদিন সে কামিনীর নাচও দেখে ফেলল।

নাচ শেষ হলে সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করে দিল, "আহাহা—বৌদি, মনে রাখার মত জিনিস আপনার নাচ। আপনার সিনেমায় নামা উচিত, হিরোইন হওয়া উচিত—"

নাচতে নাচতে রক্ত গরম হয়েছিল, কথাটা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে কায়েম হয়ে বসল। বিনায়কের মুখে তখন যে একটা অন্ধকার ছায়া দেখা দিল সেদিকে কামিনীর চোখ পড়ল না, তার দু'চোখের সামনে তখন অসংখ্য ছবির পরদায় তারই নৃত্যগীত প্রেমাভিনয় দেখতে পেল সে।

মনের অন্ধকূপে যে কীটটা নির্জীব হয়ে ছিল, সে এবার সজীব হয়ে উঠল, বাড়তে লাগল। পাণ্ডুরঙ্গ এসে মাঝে মাঝে সেই কীটকে পুষ্ট

করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল। কেউ কি বড় শিল্পী হয়েই জন্মায়? কার মধ্যে কী শক্তি লুকানো আছে তা কি কেউ বলতে পারে? পাণ্ডুরঙ্গ না হলে যে অনেক তারকা ফিল্‌মে নামবার সুযোগই পেত না; তা শুনে শুনে কামিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহু দূরপ্রসারী হয়ে উঠল, গাড়ি বাড়ি বিলাসিতার অসংলগ্ন কাটা-কাটা ছবির সঙ্গে লাখ লাখ টাকার ঝনৎকার মিশে তাকে দুঃসাহসিনী করে তুলল।

ক্‌ধান ধান ধান ধা—ক্‌ধান ধান ধান ধা—বিনায়ক বাজিয়ে চলে আর কামিনী নাচে। বরাবরকার মত, তার চরিত্রের ঋজুতার মতই ধীর স্থিরভাবে বাজিয়ে যায় বিনায়ক। বেলা পড়তে থাকে, তাল বদলায়, লয় বাড়ে ও কমে, ঘুঙুরের তালে চেতনা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। নাচের অর্থ পুরো বোঝে না বিনায়ক, বাঁদিকে গ্রীবা হেলিয়ে বাঁ হাতের আলপদ্ম-মুদ্রায় কি বোঝাতে চায় কামিনী, কেন যে সমের মুখে পৌঁছে ষোলমাত্রার চারমাত্রাতেই শুধু সে পদক্ষেপ করে, মাঝে মাঝে কেনই বা সে বিপরীত বাহুর ওপর প্রতি হাত রেখে প্রতি দু'মাত্রায় একবার করে দু'চোখের সেই আশ্চর্য মণি দুটোকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে নিয়ে মৃদুমধুর হাসে, কিচ্ছু বোঝে না বিনায়ক, তবু সে বাজায়। বাজাতে বাজাতে অবসন্ন দিবালোক ক্রমে রক্তিম হয়ে ওঠে, শেষে একসময় বর্ণহীন হয়ে সন্ধ্যালোকে বিলীন হয়ে যায়।

কামিনী হঠাৎ থেমে বলল, ব্যস্—আজ আর না—"

বিনায়কও থামল।

ভেতর থেকে পাণ্ডুরঙ্গের গলা শোনা গেল, "সাধু-সাধু—"

ওরা দুজনে দরজার দিকে তাকাল। ভেজানো দরজা ঠেলে

পাণ্ডুরঙ্গ ভেতরে এল, বলল, "রোজ ভোর বেলায় সূর্য ওঠে, কিন্তু তবু প্রতি সকালেই তাকে নতুন করে অভ্যর্থনা করি আমরা—"

কামিনীর ললাটে, গ্রীবায়, কণ্ঠে তখন শ্রম-জনিত স্বেদবিন্দু গলিত মুক্তোর মত চকচক করছে, রক্তের উচ্ছ্বাসে রক্তিম মুখটির প্রতি রোমকূপে তা অভ্রকণার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাণ্ডুরঙ্গের কথায় সে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে থাকতে পারল না। তার নাচ, তার শরীরের গঠন, তার রূপ আর গুণ নিয়ে ভাই পাণ্ডুরঙ্গের মত বহুদিন কেউ এমন প্রশংসা করেনি।

বিনায়ক অভ্যর্থনা জানাল, "এসো হে পাণ্ডুরঙ্গ। বসো, একটু কফি চলবে?"

"রাজী—বৌদি যদি শুধু এক গেলাস জলও দেন তাহলেও চলবে"—

"বাঃ—তা দেব কেন?" কামিনী ঘুঙুর খুলে ফেলছিল, এবার উঠে দাঁড়াল, "আমরা গরীব হ'লেও কি ভাইবন্ধুর—"

পাণ্ডুরঙ্গ কথা শেষ করিতে দিল না, বলল, "সাবাস্—স্ত্রীজাতিকে চটিয়ে দিলে যে দুটো জিনিস পাওয়া যায়, তা আমি জানি—হয় ঝাঁটা, না হয় মিষ্টি"—

সবাই হাসল কিন্তু বিনায়ক কেন যেন জোরে হাসতে পারল না। আজকাল পাণ্ডুরঙ্গের দিকে তাকালেই মাঝে মাঝে কেন যেন স্যুটবুট-পরা একটা শেয়ালের কথা মনে পড়ে তার। পরমুহূর্তেই লজ্জা পায় বিনায়ক—ছিঃ, এ কী ঈর্ষ্যা, এ কী সঙ্কীর্ণতা তার। কিন্তু—

পাণ্ডুরঙ্গ বলল, "আজ বেশীক্ষণ বসতে পারব না ভাই বিনায়ক—শুধু তোমাদের বলতে এসেছিলাম যে, কাল থেকে আবার আমাদের শুটিং শুরু হচ্ছে—একদিন দেখতে এসো"—

বিনায়ক হাসল শুধু।

কামিনী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "যাব, নিশ্চয়ই যাব,—বসুন ভাই পাণ্ডুরঙ্গ, কফি না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবেন না।"

ইলেকট্রিক ট্রেনে দাদরে যেতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। স্টেশন থেকে মিনিট কয়েক হাঁটলেই স্টুডিও—সেখানেই রজত ফিল্মসের অফিস।

স্টুডিয়োর গেট থেকে ভেতরে স্লিপ যেতেই চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাণ্ডুরঙ্গ এসে হাজির। কামিনীর ওপর চোখটা কয়েক সেকেণ্ড নিবদ্ধ হয়ে রইল তার, তারপরেই কলকণ্ঠে সে অভ্যর্থনা জানাল, "আরে আসুন—আসুন—এইদিকে"—

তাকাবার মতই দেখাচ্ছিল কামিনীকে। বর্ষার নতুন ঘাসের মত স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল তার মুখখানা। রূপ মানে তো মৃগনয়ন, দীর্ঘকেশ, মরালগ্রীবা, এবং আরো উপমা নয়—রূপ মানে একটা কিছু যা আলোর মত, যা বর্ণের মত,যা দৃষ্টি এবং মনকে অভিভূত করার মত। কিছুদিন আগে কেনা কলাপাতা রংয়ের মারাঠী শাড়িটাকে অতি যত্নে পরেছে কামিনী, গলায় পরেছে সোনার দানা-মেশানো এয়োতির চিহ্ন মঙ্গলসূত্র, চোখের নীচে কাজলের চারুরেখা মস্ত বড় খোঁপাটিকে ঘিরে রজনীগন্ধা আর জড়ির সুতো দিয়ে গাঁথা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মালা।

প্রডাকৃশান ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল পাণ্ডুরঙ্গ। সুদর্শন, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী ছোকরা—নাম প্রিয়লাল। তলোয়ারের মত ধার তার কথায় আর চাউনিতে। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে বিনায়কদের নিয়ে ফ্লোরের এক কোণে বসিয়ে দিল সে।

ডাইরেক্টার মিঃ গুণরাজের সঙ্গেও আলাপ হল। এতবড় নামজাদা লোক, কিন্তু কী নিরহঙ্কার অমায়িক। হেসে হেসে কথা বলতে বলতে চা আনার হুকুম দিয়ে গুণরাজ চেয়ার টেনে তাদের পাশে বসল।

তখন লাইটিং হচ্ছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা দূরে আড্ডা দিচ্ছে। কামিনী ঘামতে ঘামতে গুণরাজের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, আর আড়নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল শিল্পীদের। ছোট্ট, সুন্দর সেটখানি—ঠিক যেন বাস্তবের মত। কামিনীর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠল।

বিনায়কের মনের অবস্থা টের পাওয়া যায় না। ওকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায় এই পরিবেশে। বড় বড় সার্চলাইটগুলোর আলোর দীপ্তি, চিৎকার, ব্যস্ততা, হাসি—

"—পাঁচনম্বর দো"—

"টিল্ট আপ"—

"কাটার লাগাও"—

কত শব্দ! জীবন এখানে অনবরত উষ্ণ-প্রস্রবণের মত টগবগ করছে। বিনায়ক সবার দিকে তাকায়, তাকাতে তাকাতে গুণরাজকে দেখে। লোকটার বয়স মাঝারী—আত্মতৃপ্ত, যশস্বী লোক—কিন্তু হু'চোখের মণি হুটো তার সাপের চোখের মত। কামিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার তার সেই চোখ হুটো কামিনীর মুখ থেকে পায়ের দিকে নামছে।

"চা নিন—"

"থাক্—"

"লাইটস্ রেডি—ই—ই—ই ?"

"না, না, তা হবে না—আপনি আমাদের অতিথি"—

"রে—ডি—ই—ই—ই"—

গুণরাজ উঠে দাঁড়াল, বলল, "মনিটার প্লীজ"—

সহকারী ডাইরেক্টার হাঁক দিল, "আর্টিস্টরা আসুন"—

আলো—কী তীব্র আলো—কী অদ্ভুত এই আলোর ঔজ্জ্বল্য! আলোর নীচে উজ্জ্বল জীবনের প্রতীক ওই অভিনেতা আর অভিনেত্রী।

শিল্পকর্ম, আনন্দ, যশ, অর্থ, সুখ, শান্তি—অসংলগ্ন কথা আর ছবির মিছিল মস্তিষ্কের কোটরে বারবার চলাফেরা করে।

মোহগ্রস্তের মত অনেকক্ষণ বাদে ফ্লোর থেকে বেরোয় ওরা দুজনে। সঙ্গে পাণ্ডুরঙ্গ। বাইরেও যেন স্বপ্নলোক এই স্টুডিয়ো। ঝকঝকে সব গাড়ি থেকে চিত্রতারকারা এসে নামছে। এই আশ্চর্য, পৃথক আর আলো-ঝলমল জগতে সে যদি—

"কেমন লাগল?" পাণ্ডুরঙ্গ হঠাৎ প্রশ্ন করল বিনায়ককে।

ফুলতোলা কাপড়ের থলিটা হাতে চলতে চলতে বিনায়ক হঠাৎ চমকে উঠল, বলল, "অ্যাঁ? ভাল। কোনদিন তো আগে দেখি নি—বেশ নতুন লাগে চোখে"—

ঘড়িটা পুরনো, কিন্তু চলে ঠিক—বিনায়ক সেই পুরনো ঘড়ির কাঁটাকে মানে—প্রতিদিনকার মত আজো সে এগারোটার সময় শুয়ে পড়ল। আজ কামিনীকে যেন নূতন লাগছে তার চোখে।

"কামিনী"—

"কি?"

"কাছে এসো"—

"কি?"

"বোস"—

"কি বলবে?"

"আলোটা আর ভালো লাগছে না"—

"নিভিয়ে দিচ্ছি"—

আলোটা নিভল, কিন্তু কামিনী আর কাছে ফিরে এলো না, জানালার কাছে গিয়ে বসল সে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়াতে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত আরো অন্ধকার হয়ে চিঞ্চোলীর যে মাঠ

আর জলাভূমিকে দুর্ণিরীক্ষ্য করে তুলেছে—সেই দিকেই তাকিয়ে রইল কামিনী।

বিনায়ক একবার অন্ধকারে হাসল, তারপর চোখ বুজল।

ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল বিনায়কের জীবন। ভোর হতেই কাগজ পড়ে, কফি খেয়ে, দাড়ি কামিয়ে চান করল সে, তারপর খেয়েদেয়ে তার সেই ফুলতোলা ছোট্ট থলিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এঘরে ওঘরে আড্ডা দিতে লাগল কামিনী। গতকালকার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল। নায়েকের বৌ কাছে সরে এল, ছবিলদাসের মেয়ের চোখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা ঘনাল, আর মীরচান্দানীর শালীর চোখে চোখে বিগতযৌবনার ঈর্ষা কালো হয়ে উঠল।

এমন সময়ে চত্তলের একটা গুজরাটি ছেলে এসে বলল, "আপনার স্বামীর বন্ধু আপনাকে ডাকছে"—

কামিনী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাণ্ডুরঙ্গ ঘরে এসে বলল, "এক পেয়ালা চা বৌদি"—

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—

কামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিনায়ক বাড়ি নেই। প্যাটেল চত্তল ভাত-রুটি পেটে ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে যাঁতা-পেষার শব্দ আসে একটা ঘর থেকে। সমুদ্রের ওদিক থেকে জোলো হাওয়া আসছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, বাতাসের দোলা লেগে টুপটাপ জল পড়ে বাড়ির পেছনকার গাছপালা থেকে। মাঝরাতের মত ভৌতিক দুপুরবেলাটা।

পাণ্ডুরঙ্গ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে একবার দেখল কামিনীকে, রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "মিঃ গুণরাজ তো কাল আপনাকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন বৌদি"—

"কি যে বলেন"—

"মিথ্যে নয়—পরের বইটাতে যেমন নায়িকা তিনি কল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে আপনি হুবহু মিলে যান"—

শুনতে শুনতে কামিনীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

পাণ্ডুরঙ্গ বলতে লাগল, "আপনার আগ্রহ দেখেই আমি ব্যাপারটা আগে থেকে ঠিক করেছিলাম—গুণরাজ আমাকে বলেছেন যে, আপনার আগ্রহ থাকলে তিনি আপনার কথাটা বিশেষ করে ভাববেন। আপনি নৃত্যপটীয়সী হওয়ায় আরো আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। তাছাড়া নতুন শিল্পী আমাদের নিতেই হবে। দেশের অবস্থাটা কী—এখন কি আর লাখ টাকা দিয়ে লোক রাখা যায়? তাহলে—কী মত আপনার?"

কামিনী উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করছিল, হেসে বলল, "আজ ওকে বলব—কিন্তু—কিন্তু আমি কি সত্যি পারব?"

"আপনি যথার্থ শিল্পী বলেই এ প্রশ্ন করছেন—আপনার মধ্যে যে কী আছে, তা আপনি জানেন না"—কামিনীর দিকে তাকিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ মিটিমিটি হাসতে লাগল।

আজ মনের মধ্যে ভালবাসার প্রদীপটি আর জ্বলে নি। লাইব্রেরি থেকে আনা গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসটা খানিকটা পড়ে বিনায়ক সযত্নে তা তাকে তুলে রাখল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কামিনী তাকে লক্ষ্য করছিল, এবার কাছে এসে বসল বিছানায়, বলল, "শুয়ে পড়ছ যে?"

"শোওয়া উচিত বলে"—

"না, আজ গল্প করো"—

"কেন?" বিনায়ক হাসল।

"এমনি—আমার ভাল লাগবে"—

"কিন্তু আমার যে ভাল লাগবে না—আমি দিনমজুর, আমার একটু

ঘুম দরকার”—সেই একই প্রশান্ত হাসি বিনায়কের ঠোঁটের কোণে খেলে গেল।

“না না”—কামিনী কাছ ঘেঁষে এল। তার শরীরের উত্তাপটা আজ বেশী মনে হল বিনায়কের।

“বেশ তো—বল কী বলতে চাও”—বিনায়ক স্ত্রীকে সপ্রেমে কাছে টেনে নিল।

“থাক, তোমার তো ঘুম পাবে।” কামিনী ঠোঁট ওল্টাল।

“তুমি ভারি ছেলেমানুষ”—

“না তো কি—আমার বয়স কত ?”

“তা ঠিক”—দু'হাতে কামিনীর মুখখানি ধরে দেখতে লাগল বিনায়ক।

কামিনী স্বামীর মুগ্ধতা লক্ষ্য করে বলল, “একটা কথা বলব ?”

“বল”—

“মিঃ গুণরাজের পরের ছবিতে একজন হিরোইন দরকার—আমাকে দেখে নাকি ওঁর পছন্দ হয়েছে”—

“আমি ভাগ্যবান লোক।” বিনায়ক সহজভাবেই বলল।

“না ঠাট্টা নয়, তোমার কি মত ?”

“মত কিসের ?”

“আমি যদি সিনেমাতে যোগ দিই ?”

হাত দুটো সরিয়ে নিল বিনায়ক, স্ত্রীর দিকে নতুন করে তাকাল। কিছুক্ষণ তার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল,“তুমি কি খুব ভেবেচিন্তে একথা বলছ ?”

“হ্যাঁ”—

“কেন ?”—

“কারণ—কারণ বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না, আর ভালো

লাগে না বলে আমি যা-তা কাজও তো করতে পারব না। তাছাড়া দিনরাত তোমার এই পরিশ্রম আমার ভালো লাগে না—আমাদের সংসার যে ভবিষ্যতে এতটুকুই থাকবে তা তো জোর করে বলা যায় না"—

"তুমি সিনেমাতে গেলেই সব সমস্যা দূর হবে ?"

"আমার তো তাই মনে হয়—আর আমি তো সাময়িকভাবে যোগ দেব"—

"হুঁ"-

"হুঁ" মানে ?

ক্লান্ত ভঙ্গীতে স্ত্রীর দিকে তাকাল বিনায়ক, বলল, "সিনেমার জগতটাতে যত আলো তত অন্ধকার কামিনী—ওখানে জীবন সুস্থ থাকে না"—

"কি বলতে চাও তুমি ?"

"আমার এতে সমর্থন নেই।"

কামিনী স্বামীর কাছ থেকে সরে বসল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বিনায়ক চোখ বুজল।

চিঞ্চোলীর রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেল। সমুদ্রের ধারে এদিকটাতে বেআইনীভাবে মদ বেচাকেনা চলে। অনেক রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝে এমনি ট্রাক যায়, কি করে যে আইনের চোখে—

কামিনী স্বামীর দিকে তাকাল, মৃদু ও অকম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমার যদি ইচ্ছে করে ? যদি আমি সুযোগ পাই ? যদি আমি যোগ দিই ?"

বিনায়ক চোখ বুজেই জবাব দিল, "আমি বাধা দেব না"—

স্বামীর দিকে তাকিয়ে অভিমানে দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল কামিনীর। বাধা দেবে না—কিন্তু বলার ভঙ্গী কি এমনি হওয়া

উচিত ? স্বামীর ভালবাসা কি তাহলে তার স্বার্থপরতারই আর একটা নমুনা ? সত্যিকারের ভালবাসা হলে কি বিনায়ক অমন চোখ বুজে থাকতে পারত ?

ঠিক সাড়ে ছয়টায় রোজ বাড়ি ফেরে বিনায়ক।

রোজই দরজা খোলা থাকে কিন্তু আজ তা বন্ধ। মাঝে মাঝে বাজারে যায় কামিনী—এখানে বিকেলেই বাজার জমে। সেজন্য তুজনের কাছেই একটা করে চাবি থাকে। আজো হয়ত বাজারে গেছে কামিনী।

দরজা খুলে বিনায়ক ভেতরে গেল। পোশাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে স্টোভ ধরাল সে, চা খেয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা বইটা তুলে নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু পড়তে কেমন যেন লাগে। বিকেলে এসে কামিনীকে একবার না দেখলে যেন সব কিছু সহজ মনে হয় না। বইয়ের ওপর চোখ রইল বটে তার, কান রইল বাইরের দিকে।

কিন্তু কানে কোন শব্দ এল না। যোগেশ্বরী পাহাড়ের দিকে মেঘের গায়ে লাল রংয়ের ছিটে দেখে টের পাওয়া গেল যে, আরব সাগরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সামনের কাঁচা রাস্তাতে এদিককার শেষ ইলেকট্রিক বাতিটা জ্বলে উঠল, আর সেই আলোর সংকেত পেয়েই যেন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল চারদিক। তবু কোন লঘু পায়ের শব্দ কানে এল না। রাত হল। ঘড়ির কাঁটা দেখে রান্না চাপিয়ে দিল বিনায়ক। আরো রাত হল। ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী আজ রাত সাড়ে ন'টায় খাওয়াটা হল না।

দশটা বাজল।

হঠাৎ কামিনীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজার গোড়ায় এগিয়ে গিয়ে পাণ্ডুরঙ্গকে দেখতে পেল বিনায়ক।

পাণ্ডুরঙ্গ হাসল, "পৌঁছে দিতে এসেছিলাম রে বৌদিকে।"

"ও"—

"যাই তা'হলে, রাত হয়েছে"—

"তা হয়েছে"—

"হ্যাঁ—পরে দেখা করব—আমার আবার কাজ আছে"—

পাণ্ডুরঙ্গ অন্তর্হিত হলো।

কামিনী ভাল শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে মৃদুকণ্ঠে বলল, "রজত ফিল্মসের প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—সেই কোলাবাতে থাকে"—

"হু"—

"কী বড়লোক! উঃ—আমার তো"—

বিনায়ক কথা কেটে বলল, "তুমি একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল হয়—আমার খিদে পেয়েছে"—

কামিনী ঢোঁক গিলে একবার স্বামীর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বুঝল না সে। বড় নির্বিকার মুখটা, ভাবলেশহীন।

খেয়ে উঠে বিনায়ক মসলা মুখে দিয়ে বলল, "তা'হলে হিরোইনের কাজটা পাবে মনে হচ্ছে?"

কামিনী চঞ্চল হয়ে কাছে এল। হেসে বলল, "প্রোডিউসার তো খুব ইচ্ছুক মনে হল।"

"তোমার কি ইচ্ছে?"

কামিনীর শরীর টান টান হয়ে উঠল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমার ইচ্ছে তো তোমাকে বলেছি।"

বিনায়ক আর কথা বলল না।

পরদিন বিনায়ক ফ্যাক্টরী যাবার উদ্যোগ করছে, কামিনী রান্নাঘরের দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বলল, "আজও হয়ত আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।"

বিনায়ক একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, "বেশতো—আমার কোন অসুবিধে হবে না।"

কামিনী দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরল।

আজও কামিনীর ফিরতে রাত হল। কিন্তু আজ মনটা তার বড় ভালো, রীতিমত উত্তেজিত সে। খুশির প্রাবল্যে চিঞ্চোলীর নির্জন পথটা দিয়ে সে একাই ফিরেছে, একটুও ভয় করেনি। বাড়ি ফিরে দেখল যে দরজা ভেজানো, ভেতরে বিনায়ক শুয়ে আছে। তার ঘুমন্ত মুখটাকে দেখে কামিনীর বুকটা ছাৎ করে উঠল। বেচারী।

স্বামীর কাছে গিয়ে সে ডাক দিল, "শুনছ—ও স্বদেশী মহারাজ।" আদর করে বার বার ডাকল সে।

বিনায়ক চোখ মেলল।

"কামিনী!"

"হ্যাঁ—না খেয়েই শুয়েছ যে। ওঠ—খাবে চল।"

বিনায়ক হাসবার চেষ্টা করল, ঘুমজড়ানো চোখের দৃষ্টি তার অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এল এবার! সে বলল, "আজ আমি স্বার্থপর হতে শিখলাম কামিনী—একা একাই খেয়ে নিয়েছি।"

কামিনী হাসল। "খেয়েছ! যাক্ বাঁচলাম—ভাল করেছ"—

হাসল বটে, কিন্তু মনে মনে কি খুশি হল কামিনী? মোটেই না।

"কি খবর তোমার? হিরোইন হওয়ার রোমাঞ্চকর পর্বের কতদূর এগোল?"

"কাল আমার টেস্ট হবে—ক্যামেরা আর সাউণ্ড দুই-ই।"

"পাশ করলেই তো স্বর্গরাজ্য?"

"তার মানে? তুমি কি ঠাট্টা করছ?"

"ঠাট্টা! মাঝরাতে ঘুমচোখে মানুষ ঠাট্টা করে না। আচ্ছা কামিনী, তুমি কি সত্যি শেষ পর্যন্ত পাগল হলে?"

কামিনী শক্ত হয়ে দাঁড়াল, "পাগল কেন?"

"কেন জানি না, তবে তোমায় দেখে তাই মনে হচ্ছে। কামিনী, আমাদের দেশ এখনো নারীকে সম্মান করতে শেখেনি।"

"শেখেনি বলেই শেখাতে হবে।"

"তার মানে তুমি সিনেমাতে যাওয়ার বাসনাটা পরিত্যাগ করতে পারছ না?"

"না"—

"বেশ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

বিনায়ক পাশ ফিরে শুল। কামিনী বসে বসে জ্বলতে লাগল রাগে, অভিমানে। বিনায়কের কী হয়েছে? এমন সঙ্কীর্ণ তো সে আগে ছিল না। স্বার্থপর। এতদিনে তার স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। না সে হারবে না, সে স্বামীকে দেখিয়ে দেবে যে শিল্পী হয়েও সংসার করা যায়।

"কামিনী"—

বিনায়ক হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল, "একটা কথা ভেবেছিলাম বলব না—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, না বললে আমি শান্তি পাব না।"

কামিনী তাকাল, "কি কথা?"

"তোমার সিনেমাতে যোগ দেওয়াটা আমার পছন্দ নয়। সেদিন সিনেমার জগৎটাকে আমার সুস্থ বলে মনে হল না। ওখানে বড় বেশী আলো, তার চেয়েও বেশী অহঙ্কার—মানুষের চিত্তবৃত্তি ওখানে সরল পথে চলতে পারে না—ওখানে তাদের গতি বক্র—টাকার জোরে মানুষরা ওখানে শিল্প আর শিল্পীদের সর্বনাশ করে দেশকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। তুমি ওখানে যেয়ো না কামিনী—আমার অনুরোধ।"

"তার মানে তুমি আমায় দিনের পর দিন ঘরে বসে কাটাতে বলো?" কামিনী জ্বলে উঠল।

"সংসার করতে বলি।"

"দিনরাত তোমার চরণাশ্রিত দাসী হয়ে নিজের সত্তাকে লোপ করে দেব?"

"তোমার আমার জীবন এক।"

"তার মানে তোমার এই দারিদ্র্য-বিলাসকে সারা জীবনের জন্য বরণ করে নেব?"

"ভারতবর্ষের সবাই দরিদ্র, কামিনী"—

"না—না—না"—কামিনী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কথা আমি মানব না। তুমি স্বার্থপর—তুমি ভীরু—তুমি আমার বিষয়ে ভয় পাচ্ছ, আসলে তুমি আমায় খারাপ ভাবছ। তোমার এই ভুল ধারণা আমি ভাঙব তবে ছাড়ব—আমি সিনেমাতে যোগ দেবই দেব।"

বিনায়কের মুখচোখ হঠাৎ আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল, সেই পুরনো হাসি ফিরে এল তার ঠোঁটের কোণে, কয়েকমুহূর্ত কামিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "এর পর আর কোনদিন এ নিয়ে কথা বলব না কামিনী—আমায় মাপ কর।"

এবার সে সত্যিই শুয়ে পড়ল। কামিনী ছুটে বাইরের বারান্দায় গেল। বাইরে অন্ধকার, অনেক দূরে ল্যাম্প-পোস্টটা দেখা যাচ্ছে, রাস্তা নির্জন। সেই অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল কামিনী আর জ্বলতে লাগল। আলো, যশ, অর্থ, শিল্প আর পাণ্ডুরঙ্গের মিষ্টি মিষ্টি কথা তার সমস্ত চৈতন্যকে মোহগ্রস্ত করেই রাখল।

ভোরে উঠতে দেরি হল কামিনীর। উঠে দেখল যে, ঘরে বিনায়ক নেই। হয়ত কোথাও গেছে, চত্তলের অন্য কোন ঘরে।

কিন্তু বেলা বাড়তে লাগল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলে যে বিনায়ক, সে আজ কোথায় সময় নষ্ট করছে? আজ কি রবিবার? কিন্তু তার সেই ফুলতোলা থলি তো নেই! তাহলে? ওঃ, রাগ করেছে। কাল রাতের ব্যাপারটা ভোলেনি বিনায়ক। কিন্তু স্বামীর এমন অভিমান তো কামিনী আগে কখনো দেখেনি। নির্বিকার, প্রশান্ত বিনায়ক এত মেজাজী!

কিন্তু তারও তো মেজাজ আছে। কামিনীও তো রাগ অভিমান করতে পারে। না, সে মুষড়ে পড়বে না। বিকেলে হয়ত বিনায়ক ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে।

বেলা বারোটার পর স্টুডিয়োতে যাওয়ার কথা ছিল, কোনমতে চাট্টি খেয়ে কামিনী গেল।

পাণ্ডুরঙ্গ হেসে বলল, "ব্যাপার কি কামিনী দেবী, মুখটা শুকনো যে—মানের পালা-টালা বুঝি"—

"না না—এমনি"—

"বসুন, বসুন। গুণরাজ সাহেবকে খবর দিচ্ছি"—

"আজ আমার টেস্টটা"—

"হবে হবে—ব্যস্ত কেন?"

কিন্তু হল না। সেটে বসে বসে ঢুলুনি আসতে লাগল কামিনীর। গুণরাজ এসে মাঝে মাঝে দু'একটা আজে বাজে কথা আর রসিকতা করে যেতে লাগল।

বিকেল হতেই সে বিদায় নিল। পাণ্ডুরঙ্গ বলল যে, পরের দিন টেস্ট হবে।

বাড়ি ফিরল কামিনী। প্রায় দৌড়ে। কিন্তু কোথায় বিনায়ক? দরজা তালাবন্ধ যে।

দরজাটা খুলল কামিনী। শূন্য ঘর।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। আকাশে মৌসুমী মেঘের গুরু গুরু ডাক শোনা গেল। তবু এল না বিনায়ক।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে আর মীরচান্দানীর শালী এসে দু'একবার উঁকি মেরে গেল। রাতেরবেলা এই সময় বিনায়ক নেই, এ তারা প্রায় দেখেই নি।

মাঝরাতে মৌসুমী তাণ্ডব শুরু হল। হাওয়ার ধাক্কায় দরজা জানালা থেকে খট্ খট্ শব্দ হতে লাগল, বৃষ্টিধারার অশ্রান্ত বর্ষণশব্দের সঙ্গে বাতাসের গোঙানি শুনে কামিনীর বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পাঁচ বছর ধরে তারা একসঙ্গে জীবনযাপন করছে, ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল হিসেব-করা জীবন। এই হিসেবী জীবনের ক্লান্তিকে যার কিছুদিন ধরে অসহ্য মনে হয়েছিল, আজ কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনের একটি হিসেব ভুল হতেই চোখের ঘুম পালিয়ে গেল।

ভোর হতেই কামিনী ছুটল প্লাস্টিক কোম্পানিতে। এভাবে যে স্বামী তাকে শাস্তি দেবে, তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বামীকে সে পেল না। খোঁজ নিয়ে শুনল যে, আজ থেকে বিনায়ক ছুটি নিয়েছে। হঠাৎ কি এক জরুরী ব্যাপারে কাল সে খুব দৌড়োদৌড়ি করে ছুটি নিয়েছে—আপাতত দশ-দিনের জন্য।

রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে চলতে লাগল কামিনী। বিনায়ক যে এমন কঠোর হতে পারে, তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

কিন্তু এবার ?

জিদ চাপল তার। সে রজত ফিল্মসের অফিসে গেল। গুণরাজ তাকে খুব খাতির করে বসাল। পাণ্ডুরঙ্গ আর প্রিয়লাল দৌড়া-দৌড়ি আরম্ভ করল কামিনীর টেস্ট নেবার জন্য।

গুণরাজ নিজে কামিনীর মেক-আপ তদারক করল। কামিনীর

মাথার ভেতর তখন এক জটিল অবস্থা। বিনায়কের আঘাতের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর নতুন অনুভূতি। রংয়ের প্রলেপের সঙ্গে সে যেন কোন এক গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। গুণরাজ সাহেবের তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টিটাও রঙের ঘোরে যেন বদলে গেল, ভালো লাগল।

তারপর টেস্ট হল।

তীব্র আলো পড়ল তার মুখের ওপর।

"হাঁটুন"—

"ঘুরে দাঁড়ান"—

"যে কবিতাটি আপনাকে বলতে বলেছি তা আবৃত্তি করুন"—

গলা কাঁপল বৈকি, কিন্তু তবু এক অদ্ভুত তীব্র স্বাদ। যে আলোক-বৃত্তের মধ্যে কামিনী দাঁড়িয়ে আছে, তার বাইরে কি কিছু আছে, কেউ আছে?

টেস্ট হতেই আড়ালে পাণ্ডুরঙ্গ বলল, "ও, কে,—চমৎকার—আপনি নির্ঘাৎ রোলটা পাবেন"—

কিন্তু এবার কেঁদে ফেলল কামিনী।

"কাঁদছেন কেন কামিনী দেবী?" পাণ্ডুরঙ্গ অবাক হল।

কামিনী কান্নার বেগ একটু থামিয়ে বলল, "আপনার বন্ধু কাল থেকে বাড়িতে নেই।"

"সে কি! কেন?"

ঠিক সেই সময়েই গুণরাজ এসে পড়ল কাছে, কামিনীর চোখে জল দেখে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল, কামিনীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "কাঁদছেন কেন?"

পাণ্ডুরঙ্গ হেসে বলল, "আনন্দে স্যার"—

"বটে। তা অমন হয়—এতবড় একটা কেরিয়ার—অমন হয়"—

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গুণরাজ অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা বলে কামিনীকে নানা আশা দিল, নানা স্বপ্ন দেখাল।

সন্ধ্যের পর পাণ্ডুরঙ্গ কামিনীকে প্যাটেল চত্তলে পেঁাছে দিল, বসে বসে সব শুনল জানল।

রাত হল। তবুও পাণ্ডুরঙ্গ ওঠবার নাম করে না।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে, আর মীরচান্দানীর শালীরা দেখে গেল যে, বিনায়ক আজো নেই এবং কামিনী একজন পরপুরুষের সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত কথা বলে যাচ্ছে।

রাত প্রায় এগারোটার সময় পাণ্ডুবঙ্গ বিদায় নিল।

ছ'দিন কেটে গেল। কিন্তু বিনায়ক আর এল না। ছ'দিন ধরে আরো ভাবল কামিনী। দুঃখ রাগ আর অভিমানের দুর্বল দিকটা কাটিয়ে উঠল সে। বিনায়কের অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহারটার কথা যতই সে ভাবতে লাগল, ততই তার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল, তার গোঁ চাপল যে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে এবং বিনায়ক ফিরে না এলে সে বিনায়কের কাছে যাবে না।

সেদিন সকালে পাণ্ডুরঙ্গ এসে হাজির।

"আজ তোমার নেমন্তন্ন কামিনী"—পাণ্ডুরঙ্গ ক্রমেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে।

নাম ধরে ডাকাটা ভাল লাগল না কামিনীর, কিন্তু পাণ্ডুরঙ্গের কথা বলার ধরনটা বড় সহজ, রাগা যায় না।

"নেমন্তন্ন ?"

"মিঃ গুণরাজের বাড়িতে পার্টি—নতুন নতুন কয়েকজন লোক আসবে সেখানে, আলাপ করিয়ে দেবেন তিনি। অবশ্য আসবে, কেমন ?"

"আচ্ছা—কিন্তু আমার টেস্টের ফলাফল ?"

"ওখানেই জানতে পারবে"—পাণ্ডুরঙ্গ মিষ্টি করে হাসল, "মনে রেখো রাত ন'টায় পার্টি"—

"অত রাতে ?"

"এ সব বিলিতিয়ানা—বোঝ না—যাকগে তৈরী থেকো তাহলে, আমি এসে তোমায় গাড়ি করে নিয়ে যাব"—

বেলা বাড়ে। দুপুর হয়। ঘরে বসে সময় কাটে না। আরব সাগরের দিক থেকে মেঘের ধোঁয়া আকাশ দিয়ে গড়িয়ে যায় যোগেশ্বরী পাহাড়ের দিকে। আলোছায়ার খেলা শুরু হয় চিঞ্চোলীর জনবিরল রাস্তার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা জোলো হাওয়া ঘরের ভেতর এসে স্মৃতির পাতা উল্‌টে দিয়ে যায়। যেদিকেই তাকায় কামিনী, বিনায়কের কথা মনে পড়ে। পাঁচ বছরের অজস্র খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ে আর অবাক হয় কামিনী। সেই বিনায়ক এমন কাণ্ড করল! বিয়ের আগেকার দিনগুলো যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়—কোল্‌হাপুরের সেই দিনগুলো।

ঘরে বসে সময় কাটে না।

কিন্তু তবু সময় ঠিকই কাটে।

সন্ধ্যে হয়। আয়নার সামনে বসে সাজতে আরম্ভ করে কামিনী। নিজের রূপ দেখে আস্তে আস্তে সে ভুলে যায় সব কথা, নিজেকে ভালো লাগে তার, চোখের কোণে কাজল লাগাতে লাগাতে যখন সে নিজেকে নতুন করে ভালবেসে ফেলে, তখন হঠাৎ আবার মনে হয় যে, এই আত্মরতির সুখটাও যেন পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না একজনের জন্য।

মোটরের শব্দ হয়।

নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের বোন আর মীরচান্দানীর শালী বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। প্যাটেল চত্তলের পূব-কোণার ঘর থেকে বেরিয়ে

কামিনী যখন পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে গুণরাজের গাড়িতে গিয়ে চড়ে তখন তারা চিনতেই পারে না। স্বামী থাকতে মেয়েটার এই আশ্চর্য দেহসৌষ্ঠব আর রূপ কোথায় ছিল ?

গাড়ির শব্দটা মিলিয়ে যায়, কিন্তু প্যাটেল চত্তলের নবজাগ্রত কৌতূহল মেলায় না। বিনায়কের উধাও হওয়া আর কামিনীর এই রূপান্তর নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনায় প্যাটেল চত্তল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মেয়েরা মেয়েদের গা টেপাটেপি করতে থাকে, হাসতে থাকে আর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে মেয়েরা স্বামীদের কাছ ঘেঁষে কামিনীর নামে কুৎসা করতে করতে তাদের গায়ে ঢলে পড়ে।

চিঞ্চোলীর রাস্তায় শেষরাতের তরল অন্ধকারে যখন মোষের দুধের বোঝা নিয়ে পশ্চিমা গোয়ালারা চলাচল শুরু করেছে, তখন গাড়িটা ফিরে এল।

চত্তলের দু' একজন বারান্দায় বসে দাঁতন করছিল তখন। কামিনীকে তারা ঘরে যেতে দেখল। গাড়িতে শুধু ড্রাইভার ছিল।

ঘরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কামিনী। তার চুল আলুথালু, তার শাড়ির পাট অন্তর্ধান করেছে, তার চোখের তারাতে আগুনের জ্বালা। রাত্রির স্মৃতিটা দেহের প্রতি রোমকূপে এক অশুচি-প্রলেপের মত লেগে রয়েছে—জ্বলছে—

রাত ন'টায় গিয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কামিনী। গণ্যমান্য অনেক লোক ছিল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া, হাস্য-পরিহাস শুরু হল। মদ যেখানে নিষিদ্ধ মদ খাওয়াটাই সেখানে সবচেয়ে বড় আভিজাত্য। কামিনীর কাছে গেলাস দিতেই কামিনী তা সরিয়ে দিল।

পাণ্ডুরঙ্গ কাছে এসে ফিসফিস্ করে বলল, "অতিথিদের অপমান হবে—খেয়ে ফেলো—খুব হালকা জিনিস"—

কামিনী খেতে বাধ্য হল। কি দরকার চটিয়ে—গুণরাজ রাগলে এখন সে দাঁড়াবে কি করে?

তারপরে তার খেয়াল নেই কখন নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছে। কি করেছে সে। খেয়াল হল গুণরাজের শয়নকক্ষে। অবিবাহিত গুণরাজের রোমশ বুকের পাশে কামিনীর নেশাটা যখন তরল হল, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে—। তখন তার সমস্ত শরীর যেন একটা ক্যানেসের মধ্যে জ্বলছে—

আয়নাটা তুলে নিল কামিনী, মুখের চেহারা দেখে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দরজার সামনে দিয়ে প্যাটেল চত্তল উঁকি মেরে যেতে লাগল। ছেলে বুড়ো মেয়ে—সবাই। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ দোলা লেগেছে, প্রতিদিনকার ডাল, আচার আর রুটির জীবনে আজ নতুন একটা মুখরোচক জিনিসের আমদানি হয়েছে।

কিন্তু কেউ ভেতরে এল না।

ঠাণ্ডা মেঝের ওপর ঠায় বসে রইল কামিনী।

দুপুর হল।

এতক্ষণে একজন ভেতরে এসে দাঁড়াল। কামিনী তাকাল।

পাণ্ডুরঙ্গ। তার মুখে হাসি।

"কি করছ কামিনী? তোমার টেস্ট দেখেছি আমরা—ফাস্ট ক্লাস —গুণরাজ সাহেব তো একেবারে"—

"বেরোও"—কামিনী এতক্ষণে যেন প্রাণ ফিরে পেল।

ছোট চোখ আরো ছোট করল পাণ্ডুরঙ্গ, "মানে? কি হল?"

ঘরের কোণে গিয়ে তরকারি কাটার বড় ছুরিটা তুলে নিল কামিনী, ঘুরে বলল, "বেরোও বলছি— নইলে"—

বাকিটা আর বলতে হল না। পাণ্ডুরঙ্গ এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যাটেল চত্তলের পুবকোণার ঘরটাতে একদিন সুখ ছিল, শান্তি ছিল। আজকাল সেখানে নরকের অশান্তি পাক খেতে লাগল। ধুলো জমল ঘরের মধ্যে, বিছানা-পত্র ময়লা হল, অযত্নে মলিন হয়ে উঠল সব কিছু, তক্তাপোশের নীচে বিনায়কের বাঁয়া তবলা অনড় হয়ে পড়ে রইল।

দিন কাটতে লাগল ;

কিন্তু বিনায়ক এল না।

বর্ষার দিন শেষ হতে চলল। মৌসুমী মেঘের আবেগ কমে এল, আকাশের নীল রং পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল, তবু কোন খবর পাওয়া গেল না বিনায়কের।

একা একা ছটফট করে কামিনী। প্যাটেল চত্তল হাসাহাসি করে, কানাকানি করে। অতীতের মত মাঝে মাঝে দু'এক-বার চেষ্টা করেছিল কামিনী—প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আলাপ করে ভুলতে চেয়েছিল একটু। কিন্তু নায়েকের বৌ, ছবিলদাসের মেয়ে আর মীরচান্দানীর শালী কথা বলেনি তার সঙ্গে, হাই তুলে, কাজের বাহানা দিয়ে এড়িয়ে গেছে, সরে গেছে।

কিন্তু দিন চলবে কি করে? সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে কামিনী আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠল। অপরাধ আর গ্লানির বোঝা তার এবার পাথর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সব দিক থেকেই কি হেরে যাবে সে? তাহলে সে বাঁচবে কি করে? বাঁচার কোন অর্থ নেই বটে, কিন্তু এখনো তো শিল্প-জগৎ তাকে অস্বীকার করেনি।

হঠাৎ সেদিন সে আবার আয়নার সামনে বসল, অনেক যত্ন করে

সাজগোজ করল, চোখের কোণে কাজল লাগালো, তারপর বাড়ি থেকে বেরোল।

প্যাটেল চত্তল আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাণ্ডুরঙ্গ অবাক হয়ে বলল, "তুমি?"

"হ্যাঁ—আসতে নেই নাকি?" কামিনী হাসল জোর করে।

"নিশ্চয় নিশ্চয়" পাণ্ডুরঙ্গকে আজ কুৎসিত দেখাল।

"গুণরাজ সাহেব কোথায়?"

"তিনি ব্যস্ত।" পাণ্ডুরঙ্গ অন্যদিকে পা বাড়াল।

"আমার খুব দরকার।" কামিনী মরিয়া হয়ে বলল।

"তিনি খুব ব্যস্ত।" পাণ্ডুরঙ্গ কেটে পড়ল।

কামিনীর মাথায় রক্ত চড়ল, সে সোজা গুণরাজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরেতে অল্পবয়সী একটি সুন্দরী মেয়ে বসে গুণরাজের সঙ্গে গল্প করছে।

"কামিনী!"

"দেখা করতে এলাম।"

"বোস বোস"—গুণরাজ হাসল। সেই অপরিচিতা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একটু মেক-আপ রুমে যাও মিত্রা—আমি আসছি"—

মিত্রা হেসে বেরিয়ে গেল। কামিনী দেখল যে মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। কোথায় যেন একটা ঈর্ষা জ্বলতে লাগল তার বুকে।

"তারপর? কি খবর কামিনী?"

আড়ষ্ট হয়ে কামিনী বলল, "আমি—আমি কাজ চাইতে এলাম"—

"কাজ—কি কাজ দেব?"

"আপনি যে আমায় পরের বইয়ের নায়িকার ভূমিকার জন্য কথা দিয়েছিলেন"—

"কিন্তু কথা তো তুমিই ভেঙেছ কামিনী"—

কামিনী অবাক হয়ে তাকাল, "কেন ?"

"কোথায় ছিলে এতদিন ? আমি অন্য মেয়ে ঠিক করেছি—ঐ মিত্রা"—

"কিন্তু—আমি—আপনি"—

"ওর সঙ্গে কনট্রাক্ট সই হয়ে গেছে"—

আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল কামিনী, "আর আমি ?"

গুণরাজ হাসল, "বড় কাজ আর নেই—ভেরি সরি—তবে অন্য একটা অফার দিতে পারি তোমাকে"—

"কি ?"

"তুমি আমার বাড়িতে থাকো—সত্যি কথা বলতে কি, তোমার মত মেয়েদের আমার খুব ভালো লাগে"—

কামিনী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, "আমি কাজ চাই।"

"কাজ ! বেশ, তাহলে চারদিনের একটি কাজ পাবে—রোজ পঞ্চাশ টাকা হিসেবে',—

কামিনীর সুর চড়ল, "আমি নায়িকার ভূমিকা চাই"—

"চেঁচিও না কামিনী—চাইলেই সব পাওয়া যায় না"—

"কেন ? আমার টেস্ট ?"—

"হিরোইন হবার টেস্টে তুমি ফেল করেছ কিন্তু অন্য টেস্টে"—

"বদমাশ্—শয়তান"—

পেপার-ওয়েটটা ছুঁড়ে মারল কামিনী। তার পাহাড়ী রক্ত মুহূর্তে মাথায় চড়ে গেল।

লোকজন এল। কামিনীকে বের করে দিল তারা চড়চাপড় মেরে।

একজন বলল, "হিরোইন সাজবে !—ইঃ—আয়নাতে মুখ দেখগে বিবি।"

আয়নাতে মুখ দেখল কামিনী। অনেক বদলেছে সে। সে যে

নিজেকে সুন্দরী মনে করত, তা কার কথায় ? কার চোখ দিয়ে যে সে নিজেকে এতদিন দেখেছে, তা আজ সে টের পেল। কি আছে তার ? চোয়ালটা বড়, নাকটা বোঁচা, রংটা ময়লা, মিত্রার সঙ্গে সে তো পাশা-পাশিও দাঁড়াতে পারবে না। তবে ?

এবার ? এবার ?

মাস কাটল।

চত্তলের মালিক তাগিদ দিল। মঙ্গল-সূত্র তো বেচা যায় না, চুড়ি চারগাছা বেচল সে।

অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হল কামিনী, তারপর একদিন প্লাস্টিক কোম্পানিতে গেল বিনায়কের খোঁজে। শরীরটা খারাপ লাগছিল, তবু গেল। কিন্তু গিয়ে যা শুনল, তাতে পায়ের নীচেকার মাটি দুলে উঠল। বিনায়ক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। অন্য কোথায় নাকি সে বেশি মাইনের একটা চাকরি পেয়েছে—দেড় শো টাকা মাইনে।

বাড়ি ফিরল সে, ফিরে শুয়ে পড়ল।

যখন চোখ মেলল, তখন তার গা পুড়ে যাচ্ছে, তখন রাত গভীর।

জানালার গোড়ায় কার যেন ফিসফিস ডাক শোনা গেল।

"এই—দরজা খোল—এই"—

প্যাটেল চত্তলের কোন ক্ষুধার্ত পশু ডাকছে। চত্তলেই বারবণিতার সন্ধান পেয়েছে সে। কামিনী তিক্ত হেসে চোখ বুজল। যা হবার হোক।

কিন্তু হল না কিছুই, জ্বর বাড়ল।

ক্রমে চত্তল জানল। কে একজন গিয়ে একজন বুড়ো মারাঠী ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার বলল, "টাইফয়েড।"

প্যাটেল চত্তল ব্যস্ত হয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডাকল। কামিনীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল তারা। আপদ গেল।

হাসপাতালে ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাওয়ায় নার্স, জ্বর দেখে।

দিনের পর দিন কাটে।

বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে যায় দিনগুলো। জ্বর ছাড়ে দিন পনরো বাদে। তারপর আরো ক'দিন কাটে সুস্থ হতে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখে কামিনী। কিন্তু কিছুই ভাবে না। কি হবে ভেবে? যা হবার হোক।

বর্ষার ঘোর কেটে গেছে—আকাশের নীলে চোখ ভরে ওঠে, সাদা সাদা মেঘের নৌকো পার্লার এরোড্রোমের দিকে উড়ে যায়। কোথায় যায়? হারানো দিন আর রাতের মত কোথায় যায় ওরা—কোন্ দিগন্তে?

আরো সাত আট দিন বাদে একদিন সকালে নার্স এসে বলল, "আজ তুমি ছাড়া পাবে।"

কামিনী তাকাল, "আজই?—আরো ক'দিন থাকা যায় না?"

নার্স হাসল, সবাই যেতে চায় আর তুমি থাকতে চাও? না ভাই, আমাদের বেডের বড় দরকার—তা ছাড়া তুমি তো ভাল হয়ে গেছ"—

বেলা তিনটে নাগাদ ছাড়া পেল কামিনী। নার্স সঙ্গে সঙ্গে এল বাইরে পর্যন্ত।

হাসপাতালের গেটের কাছে এসে বড় দুর্বল মনে হল, কামিনী দাঁড়াল। এবার? কোথায় যাবে সে? কি করবে? কোল্হাপুরে এমন কেউ তো নেই আর। প্যাটেল চত্তলে গিয়ে কিসের জোরে থাকবে সে? মুহূর্তের জন্য পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার এসে তার চোখের সামনেটা গ্রাস করল। এবার কি হবে?

"কামিনী"—

কে! যেন ইন্দ্রজাল ঘটল। অন্ধকার দূর হল। কামিনী দেখল যে, গেটের বিপরীত দিকে বিনায়ক দাঁড়িয়ে। সেই খাকি ট্রাউজার আর লংক্লথের শার্ট-পরা বহু-পরিচিত ঋজু আকৃতি, হাতে তার সেই ফুলতোলা থলিটা।

এগিয়ে এল বিনায়ক, কামিনীর হাত ধরে বরাবরকার মত প্রশান্ত হেসে বলল, "ট্যাক্সিটা ওদিকে কামিনী—আর একটু হাঁটতে হবে"—

কেমন যেন বোবা হয়ে গেল কামিনী। বিনায়ক কি ব্যঙ্গ করছে, প্রতিশোধ নিতে এসেছে, শাস্তি দিতে এসেছে? লজ্জা, দুঃখ, আনন্দ—কোন কিছুই হচ্ছে না কেন তার ভেতরে?

বিনায়ক বলল, "চল কামিনী"—

প্যাটেল চত্তল দু'দিন ধরে ফিসফিস করল। স্বামীদের বুকে ঘেঁষে মেয়েরা অন্ধকারে ফিসফিস কথা বলতে আর শুনতে লাগল।

চত্তলের পুবকোণার ঘরে বিনায়ক বদলেছে কি? বোঝা যায় না। ঘড়ির কাঁটা ধরে এখনো সে একইভাবে চলে। নতুন কোম্পানিটাতে সাড়ে দশটায় কাজ শুরু হয়—তাই আজকাল আগের চেয়ে আধ ঘণ্টা দেরি করে বেরোয় বিনায়ক। ফেরে আগের মতই, আগের মতই বই পড়ে ঘুমোয়।

কিন্তু বিছানা আলাদা। কামিনী মাটিতে শোয়। সকাল থেকে আগের মতই রান্না করে সে। বিনায়ককে খেতে দেয়, স্বামী অফিসে গেলে সে নিজে খায়, তারপর সারা দুপুর বসে বসে ঝিমিয়ে কাটায়।

কিন্তু কামিনী কি বেঁচে আছে? না—এর চেয়ে তার মৃত্যু ভালো ছিল। হাসপাতাল তাকে বাঁচিয়েছে এক দফা—বিনায়ক আবার নতুন করে ফল আর দুধ এনে বাঁচাতে চাইছে।

সে বিনায়কের দিকে তাকাতে পারে না। বিনায়ক একই রকম—নির্বিকার, নিঃশব্দ। যেচে সে কিছু বলে না। কামিনীর ভয় হয়। এ কী জীবন! ঘৃণার দেওয়ালে তুলে বিনায়ক কেন তাকে দগ্ধাচ্ছে? এ তার কেমন ঔদার্য। এর চেয়ে শাস্তি পাওয়া ঢের ভালো। দরজা বন্ধ করে বিনায়ক তাকে একদিন ধরে মারুক না—তার দেহের

পাপ হয়ত ঝরে পড়বে। না, আরো দু'একদিন দেখবে সে, তারপর গলায় দড়ি দিয়ে শেষ করবে এই জীবন।

কিন্তু দু'দিন আরো কেটে গেল। একইভাবে আত্মধিক্কারের জ্বালা সেদিন বিকেলে কামিনীর মনে চরম হয়ে উঠল। নাঃ—আজই—আজই—

সন্ধ্যের সময় বিনায়ক ফিরে এল।

কামিনী চা এনে তাকে দিয়ে রান্নাঘরে সরে গেল।

বিনায়ক চা শেষ করে বসে কি যেন ভাবতে লাগল, তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে বাঁয়া তবলাটা টেনে বের করল। ইস্ কি ধুলো জমেছে! ধুলো ঝেড়ে সে তবলা ঠুকে বাজাতে শুরু করল।

অনেকদিন পর আজ প্যাটেল চত্তলের পুবকোণার ঘরে শব্দের হরিণ শূন্যে লাফ দিয়েছে।

আবার—আবার! টিঁকতে পারে না কামিনী—এক পা এক পা করে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বিনায়ক তার দিকে তাকাল, সেই পুরোন প্রশান্ত হাসি হেসে বলল, "অনেকদিন তোমার নাচ দেখিনি—ঘুঙুরটা আজ নিয়ে এসো তো কামিনী"—

হঠাৎ কি যেন হল—ছুটে ঘরের কোণ থেকে ঘুঙুর-জোড়া নিয়ে এসে কামিনী পায়ে বাঁধতে বসল, কিন্তু বাঁধা শেষ হতেই হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিনায়ক বাজনা থামাল না, আগের মতই হেসে বলল, "তুমি কাঁদলে যে আমার বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে কামিনী"—

কামিনী মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। এতদিন দেখেনি, চোখের জলের ভেতর দিয়ে স্বামীকে সে আজ হঠাৎ নতুন করে দেখল, নতুন করে আবিষ্কার করল।

মাধবরাও থমকে দাঁড়াল। সামনের শিব-মন্দির থেকে গুণবন্তী বেরিয়ে আসছে। হাতে ফুলের সাজি, কপালে চন্দনের টিপ। কাছা দেওয়া হাল্‌কা হল্‌দে রঙের সরুপাড় শাড়ীর আঁটসাট বাঁধনে তার দেহের ললিত-রেখা সুস্পষ্ট। গোধূলি বেলার আশ্চর্য মন-কেমন-করা আলো মেখে তার শ্যাম কোমল মুখখানি ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে।

মাধব আর নড়তে পারল না। নতমস্তকে, শান্তপদক্ষেপে গুণবন্তী যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনের তার আর্তঝংকার তুলে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে ভুলে গেল যে সে ফতিমা দেবী প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক, একজন সংযত-চরিত্র দেশকর্মী, সে ভুলে গেল যে তিন মাস আগে যে কুমারী গুণবন্তীর নামের সঙ্গে তার নাম যুক্ত করে চিঞ্চোলী পাড়ায় অম্লমধুর কুৎসার হাওয়া বয়েছিল, সেই গুণবন্তী দু-মাসেই বিবাহিত জীবন শেষ করে সম্প্রতি এক মাস হল বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। সে ভাবতে ভুলে গেল যে নতুন করে তিন মাস আগেকার সেই থেমে যাওয়া কুৎসার হাওয়াকে আবার বইতে দিলে তাদের দুজনেরই অনেক ক্ষতি হবে। সব ভুলে গেল মাধব। তিন মাস ধরে সে গুণবন্তীকে দেখেনি—আজকের এই আকস্মিক সুযোগকে সে হারাতে পারবে না।

কাছাকাছি এসে গুণবন্তী হোঁচট খেয়ে থামল, থামতেই মাধবকে দেখতে পেল। চকিত বিস্ময়, লজ্জা, দুঃখ সব যেন একসঙ্গেই ভিড় করে এল তার মুখের ওপর। তারপর সে মাথা নীচু করল।

মাধব এবার এগিয়ে এল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "কেমন আছো গুণবন্তী?"

গুণবন্তী মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে মাথা নাড়ল।

মাধব বলল, "অনেক দিন তোমায় দেখিনি।"

গুণবন্তী জবাব দিল না, ধীরে ধীরে মাধবের দিকে একবার বিষণ্ণ-দৃষ্টি তুলে ধরেই নামিয়ে নিল।

মাধব গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "ভালো আছো ?" বলেই সে উপলব্ধি করল যে প্রশ্নটা অর্থহীন। তবু গুণবন্তী জবাব দিল, "ভালোই আছি"—তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলল, "আমি এবার যাই—নইলে"—

মাধব বুঝল, বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, "জানি—আচ্ছা এসো"—

গুণবন্তী চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ মাধব তাকিয়ে রইল। গুণবন্তীর সঙ্গে সঙ্গে যেন গোধুলির সেই কোমল বর্ণচ্ছটা ম্লান হয়ে এল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধব পা বাড়াল।

চিঞ্চোলির শেষ প্রান্তে মাধবের বাড়ি। টালি দেওয়া কোনমতে খাড়া একটা বাড়ির পেছন দিকে থাকে সে, একটা শোবার ঘর ও একটা রান্নাঘর নামক ঘেরা বারান্দা নিয়ে। ভাড়া দশ টাকা। সামনের দিকে থাকে কেরানীবাবু টিপনিস তিনটে ঘর ও বৌ-বাচ্চা নিয়ে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই মাধবের। মাঝে মাঝে কুঁয়োতে জল নেবার সময়েই হয়তো টিপনিসের সঙ্গে এক-আধবার দেখা হয়ে যায়। কিংবা হয়তো পুজো-পার্বণে।

স্যাঁতসেঁতে, প্রায়ান্ধকার ঘরটা। দশ টাকা ভাড়া দিয়ে মাধবের বাঁচে সত্তর টাকা। তা থেকে প্রতি মাসে পনরো টাকা পাঠায় সে পুনাতে মায়ের নামে। মা থাকেন দাদার সংসারে। দাদা সেখানকার কাছারীতে পেশকার, ভালো না হলেও খুব খারাপ অবস্থা নয় তাঁর।

বাকী পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে কায়ক্লেশে চলে মাধবের ! বিংশ শতাব্দীর নানা বিলাসিতার ভিড়ের মধ্যে বসে অতি-সাধারণ জীবন যাপন করা রীতিমত একটা সাধনা। মাধব সেই সাধনাকেই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু সে সাধনা দুরূহ। জীবনে কোন মহৎ আদর্শ না থাকলে সে সাধনাতে নিবিষ্ট থাকা যায় না। ষোল বছর বয়সে কংগ্রেসে ঢুকেছিল মাধব, তারপর বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ভেসে যায় অন্যপথে। দেশপ্রেমের সেই বিচিত্র অনুভূতিই তার জীবনকে নতুন আকার দিল। শুধু নিজের জন্য বাঁচে জানোয়ারেরা এই—উপলব্ধি তাকে সবকিছু সহ্য করতে শেখাল। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে স্বাধীন হল কিন্তু মাধবের কোন পরিবর্তন হল না তাতে। দেশের কাজ করা ছাড়াও জীবিকার জন্য যে কাজ সে করতে চেয়েছিল তাতো মাস্টারি নয়, আরও কিছু। গ্র্যাজুয়েট সে—আরো দশজন গ্র্যাজুয়েটের মত বড় চাকরির স্বপ্ন সেও দেখেছিল। স্বপ্ন শেষ হল ফতেমা দেবী প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারিতে এসে। প্রথম প্রথম সে ভেবেছিল, এ অবস্থা সাময়িক। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল—সাময়িক অবস্থাটা শেষে কায়েমী হয়ে দাঁড়াল। জাল, জুয়াচুরি ও মিথ্যার সাহায্যে যারা গান্ধীটুপি মাথায় নিয়ে ওপরে উঠল, তাদের দলে ঘেন্নায় নাম লেখাতে না পেরে মাধব বামপন্থীদের দলে গেল। নতুন আর একটা স্বপ্ন দেখা শুরু হল। স্বাধীনতা-লাভের পরে তার ফলকে সমানভাবে ভোগ করার সুখস্বপ্ন।

কিন্তু এই দশ টাকার ঘরের পশ্চিমদিকে কিছু তালগাছ আছে, আমের জঙ্গল আছে, তারপর আছে সমুদ্রের খাড়ি। সেদিক থেকে যখন রাতের বেলা সাগরজলে-সিনান করা হু হু হাওয়া আসত, যখন বাঁকা চাঁদের রূপালী আভায় নীল জল এক বিচিত্র আকার ধারণ করত, তখন মাধবরাওয়ের মনটাও হু হু করে উঠত, ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত, বুকটা খালি খালি মনে হত। ঘুম আসত না তার। ছোট্ট

একটা হিসেবের পাতা হয়ে জীবনটা যেন তার হাতের মুঠোয় এসে দাঁড়াত, আর সে ভাবত যে জীবনটা সার্থক হল না। দেশসেবা, আদর্শ —সবই সে মানে, করে, কিন্তু কেন, কেন তা? একজন দশজনের সঙ্গে জড়িত, দশজন মানেই দেশ। সেই দেশের জন্য যে সংগ্রাম তা নিজের জীবনকে পল্লবিত ও সুশোভিত করার জন্যই। কিন্তু কি হল তার জীবনে! কোন্ পথে গেলে তার এই শূন্যতা ভরে উঠবে, তার এই রিক্ততাকে ঢেকে প্রাচুর্যের আবির্ভাব ঘটবে?

গভীর রাতের এই সুগভীর বেদনা বেশ কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রইল। তারপর একদিন টিপনিসের বাড়িতে গণেশ চতুর্থীর নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সে গুণবন্তীকে দেখতে পেল। হীরেকরের মেয়ে সে। হীরেকর বিপত্নীক, একটা ক্লথ মিলে কাজ করে, দিলদরিয়া মেজাজের লোক। তার দিলদরিয়া মেজাজের কারণ মদ। গুণবন্তীকে দেখার পরেই মাধবরাও আবিষ্কার করল যে, তার মনের সেই বেদনা যেন প্রশমিত হয়ে আসছে।

সেই গণেশ চতুর্থীর রাত স্মরণীয় তার কাছে। সে সাত বছর আগেকার কথা। তখন গুণবন্তী ছিল তের বছরের মেয়ে, মাধব ছিল বাইশ বছরের যুবক। তখন তার মাইনে ছিল শুধু পঁয়তাল্লিশ টাকা। সেই পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে ক্রমে আশি টাকা হল। গুণবন্তীকে দিনান্তে একবার দেখা ক্রমে কথা বলায় এল। কথা বলতে বলতে শুধু তাকে বলা যায় এমন কথায় এসে সব কথা শেষ হল। মাধব ভালবাসল, গুণবন্তী ভালবাসল। পশ্চিমদিকের সমুদ্র ঝড়ের রাতেও আর ভয়ানক মনে হল না—অমাবস্যার অন্ধকারেও নক্ষত্রদের দীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠল।

ছোট ছোট কত ঘটনা। কত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা; খাড়ির নির্জনতায়, আমবাগানে, দূরের নারকেল-বনে জীবনের সমস্ত

ব্যর্থতাবোধ যেন হঠাৎ প্রেমের পথ আবিষ্কার করে কৃতার্থ হয়ে গেল। ফতিমা দেবী স্কুলের ছাত্রেরা অবাক হয়ে যেতে লাগল মাধবরাওয়ের পড়ানোতে, চিঞ্চৌলি পাড়ার বাসিন্দারা সুখে দুঃখে একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবীর সন্ধান পেল। প্রেমের পথ আরো অনেক পথের সন্ধান দিল মাধবরাওকে।

হীরেকর টের পেল। নেশার ঘোরে ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ বড় করে, গলা নামিয়ে একদিন সে বলল, "আমি জানি মাস্টার, তুমি কেন এত ঘন ঘন আমার বাড়িতে আসো"—

মাধব বলল, "আমি গুণবন্তীকে ভালবাসি"—

হীরেকর বলল, "আমরা ব্রাহ্মণ"—

মাধব বলল, "এ যুগটা আলাদা হীরেকরজী"—

হীরেকর বাধা দিয়ে বলল,"ওসব বড় বড় কথা বন্ধ কর মাধবরাও—সোজা কথাটা তোমায় আজ বলে দিচ্ছি—আমি এসব প্রশ্রয় দেব না। গুণবন্তীর বিয়ে আমি ঠিক করেছি—দাদরের বাজারে তার দোকান আছে, অনেক টাকার মালিক। শেষ কথা,—তুমি আর এ বাড়িতে এসো না"—

চার মাস আগেকার ঘটনা তা। তারপর একমাস গুণবন্তী এখানে ছিল। দু-বার দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে লুকিয়ে। ভয়ে তখন শুকিয়ে গেছে গুণবন্তী, ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকায় জলভরা চোখে। সাহস করে গুণবন্তীকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতেও পারল না মাধব। এসব ব্যাপারে সাহায্য করার মত কেউ নাই তার। চিঞ্চৌলি পাড়ায় ইদানীং তাদের নিয়ে যে রসালো আলোচনা চলছিল তাতে সহানুভূতির কোন কথাই ছিল না। সংকীর্ণচেতা, কূপমণ্ডূক প্রতিবেশীদের চোখের তারায় কুটিলতার আভাস দেখে মাধব কুঁকড়ে গেল। তার দশ টাকার ঘরে আবার শূন্যতার আবির্ভাব ঘটল। জীবন আবার নিরাবলম্ব

প্রেতের আকার ধারণ করল, জীবনের সামনে যে বিচিত্র পথটা ক্রমেই বহুদূর-প্রসারিত হয়ে পড়েছিল তা হঠাৎ ধ্বসে মিলিয়ে গেল।

দশ টাকার ঘরের দরজায় খিল দিয়ে, দু-হাতে কান বন্ধ করেও গুণবন্তীর বিয়ের বাজনা শুনতে পেল মাধব। তরঙ্গ-সঙ্কুল আরব সাগরের চেয়েও অশান্ত হৃদয় নিয়ে দশ টাকার ঘরকে আহত বোবা পশুর গোঙানি দিয়ে শিহরিত করে তুলল সে।

দাদরের একটি মনিহারী দোকানের প্রৌঢ় ও বিপত্নীক মালিক দামোদর কোঠারের গৃহিণীশূন্য সংসারে গিয়ে গুণবন্তী হারিয়ে গেল। ফতিমা দেবী স্কুলের মাস্টার ধীরে ধীরে রুক্ষ হয়ে উঠতে লাগল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তাদেরি মধ্যে সিনেমা দেখে অকালে-পাকা একটি ছেলে চিঞ্চৌলিতে থাকত—সে একদিন স্কুলের কালো বোর্ডের ওপর লিখে দিল 'গুণবন্তী'। মাধবরাও সে লেখা দেখল, অবোধ ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে হাসির ঝিলিক দেখল। নিঃশব্দে লেখাটা মুছে ক্লান্ত, নির্জীব গলায় পড়াতে গিয়ে সে উপলব্ধি করল যে, তার হৃদয়টাও কালো বোর্ডের মত হয়ে গেছে, এবং সেখানে গুণবন্তীর যে নাম লেখা আছে তাকে সে কিছুতেই মেটাতে পারছে না।

কিন্তু ভুলতেই হবে।

রাজনৈতিক কাজের মধ্যে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু সে যেন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার, একটা বোঝা হয়ে উঠল। একটা অর্থহীন গতানুগতিকতা। বন্ধুদের সঙ্গে যে মাধব এককালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেত আজকাল সে তাদের কাছে বোবা ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। গভীর রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে সে এক অন্ধ নিয়তির আভাস পেতে লাগল, তার জ্বলন্ত হৃদয়ের মত নক্ষত্রদেরও অতৃপ্তির আগুনে জ্বলতে দেখতে লাগল। এই বিরাট মায়া-প্রপঞ্চে তার জীবন যে কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর সেই কথা ভেবে কুঁকড়ে যেতে লাগল সে!

এমনি সময়ে খবর এল। যুবতী ভার্যাকে নিয়ে ছ'মাস ঘর করার পর দাদরের মনিহারী দোকানের মালিক হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেছে। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপ মরতেই গুণবন্তীকে বিদেয় করেছে। হীরেকর গিয়েছিল ঝগড়া করতে কিন্তু সুবিধে হয়নি। গুণবন্তীই তাতে বাধা দিয়ে বলেছে যে, এ নিয়ে হীরেকর আরো বাড়াবাড়ি করলে সে আত্মহত্যা করবে।

খবরটা পেয়ে মঙ্গলসূত্রহীনা, সিঁদুর-কুঙ্কুম-মোছা গুণবন্তীর চেহারাটা ভেবে মাধবের চোখে জল এসেছিল। কিন্তু সেই চোখের জলের সঙ্গেই সে একটা আশ্চর্য স্বস্তি অনুভব করে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল। তারপর গুণবন্তীকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। হীরেকরের বাড়ির সামনে দিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাটিও করেছিল সে। গুণবন্তীর ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, কিন্তু মামুলী দু-একটি কথা ছাড়া আর কোন কথা হয়নি। জানালার ধারে গুণবন্তীর আকস্মিক আবির্ভাবও ঘটেনি। তবু যেন কোথা থেকে প্রশান্তি এল তার মনে। গুণবন্তী চিঞ্চোলিতেই আছে। সামনের সিদ্ধি-চত্তলের পেছনকার চত্তলেই গুণবন্তী আছে। রাতের বাতাসে কান পাতলে হয়তো সে গুণবন্তীর নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাবে। সে কাছাকাছিই আছে এই অনুভূতিই আবার যেন বাঁচিয়ে দিল মাধবকে। আবার ফতিমা দেবী স্কুলের ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে মাধব মাস্টারের পড়ানো শুনতে লাগলো। আবার মাধবরাও রাজনীতির মধ্যে একটু অর্থ খুঁজে পেল। নিজের জীবনকে একটা মহৎ বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ-বীজ বলে মনে হতে লাগল।

সে আছে। অতি কাছাকাছি। এই অনুভূতির নেশা ক্রমে গাঢ় হয়ে একটা তৃষ্ণার জন্ম দিল। একবার দেখা চাই—একবার।

তারপর আজ দেখা গেল। গোধূলির বিচিত্র বিবর্ণ রঙের পটভূমিতে—

আগুনের তৃষ্ণা দাহ্যবস্তুর জন্য। তা দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে গেলে আগুন আরো ছড়ায়। তাই গুণবন্তীকে দেখবার তৃষ্ণা আরো দেখবার তৃষ্ণা সৃষ্টি করল—মাধবের অন্তরের দাহ তার সমস্ত চৈতন্যে প্রসারিত হল। ফলে ফতিমা দেবী স্কুলের বাচ্চারা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে মাধবমাস্টার আজকাল বড় অন্যমনস্ক থাকে, হল্লা করলেও ক্ষমার হাসি হাসে।

এক দিন দু-দিন করে পাঁচদিন কাটল! তারায় তারায়, সমুদ্রের নীলে, আকাশের মেঘে যে মুখটিকে বারবার ক'দিন ধরে অস্ফুট কায়া ধারণ করতে দেখেছিল মাধবরাও, সেদিন সন্ধ্যেবেলা তরকারির বাজারে গিয়ে তারি সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"তুমি!" মাধব বলল।

সজল হাসি হাসল গুণবন্তী, বলল, "বীরেশটা স্কুল থেকে এসেই বাজারে চলে যায়, তাই আমাকে আসতে হয় বাজারে"—

একটু থেমে আবার বলল, "কিন্তু তুমি?"

মাধব হাসল, পরিহাসের সুরে বলল, "কেন, আমি কি তরি-তরকারি খাই না?"

গুণবন্তী হাসল, বলল, "নিজেই রাঁধো?"

মাধব বলল, "তাছাড়া আর কে রেঁধে দেবে? গরীব স্কুল মাস্টারকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কেউ তো এগিয়ে এল না—"

গুণবন্তী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তুমি কেনাকাটা করো এবার। আমি যাই—"

গুণবন্তী পা বাড়াল। মাধব ডাকল, "গুণবন্তী—"

"কি?"

"মাঝে মাঝে সন্ধ্যের সময় এখনো খাড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়াই আমি—কাল আসবে?"

"কেন ?"

"কথা বলতাম। এই আনাজের বাজারে দাঁড়িয়ে শত-শত লোকের দৃষ্টিবাণে আহত হয়ে তো কথা বলা যায় না—"

"আমার সঙ্গে কি কথা বলার আছে তোমার মাধবরাও ?"

"হয়তো দরকারী কথা নয়—হয়তো অসংলগ্ন কথা—তবু নিজের সব কথা শোনবার মত লোক তো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই গুণবন্তী—"

"আমি যাই—"

"কাল আসবে ?"

"জানি না"—বলে গুণবন্তী দ্রুত পায়ে চলে গেল। এক রকম পালিয়েই গেল।

আবার সব গুলিয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে বাতাস আছড়ায়, তাতে সমুদ্র গোঙায়। সে গোঙানি শুনে তালগাছগুলো অন্ধকারে মাথা দোলায়, নারকেল বন মর্মরিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের বুক চিরে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে মাধবরাও সেদিন আকাশ পাতাল ভাবল আর তার বুকের মধ্যে কে যেন তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল।

পরদিন স্কুলে তার ভুল হতে লাগল। অঙ্ক কষে দেখতে গিয়ে ভুল করল সে, টিফিনের পর ঘণ্টা বাজতেও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসে যেতে ভুলে গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে তাড়া খেল।

কিন্তু পড়াতে পড়াতে লাস্ট পিরিয়ডে হঠাৎ তার মনে পড়ল যে গুণবন্তী আসার কথায় শেষ কথা বলেছিল, 'জানি না'। তার মানে কি ?

ছুটি হতেই ছুটল সে। উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে পৌঁছল খাড়ির ধারে।

কিন্তু কোথায় গুণবন্তী ? কেউ নেই। ছু-একটা চেনা লোক ওদিক্ দিয়ে চলে গেল, ছু-একজন জিজ্ঞেস করল এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ। অর্থহীন প্রশ্নের অর্থহীন জবাব দিয়ে সেখানেই বসে রইল মাধব।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল। সমুদ্রের ওপর কালোছায়া গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল। তেকোণা পালওয়ালা জেলে-নৌকাগুলো আবছা অন্ধকারে দিক্চিহ্নহীন এক অজ্ঞাত জগতের দিকে যেন ভেসে চলেছে। আকাশের গাঢ় বেগুনী মেঘের পাশে লাল রঙের ছোপ লাগল। মস্ত বড় লাল সূর্যটা যেন পশ্চিম দিগন্তের লবণ জলে গলে গলে ডুবে যেতে লাগল। তার লাল রঙের মাদকতায় সমুদ্র যেন মাতাল হয়ে উঠল, খাড়ির পাথরে এসে তার ঢেউ আছড়ে পড়ে শূন্যে ছিটকে, স্ফটিক চূর্ণের মত আবার পাথরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ধুয়ে-মুছে পিছিয়ে যেতে লাগল। তবু গুণবন্তী এল না।

হতাশায় অসাড় হয়ে এল শরীর, তাই মাধব আর উঠতেও পারল না। শুধু ভাবতে লাগল—গুণবন্তী এল না।

হঠাৎ পেছনে কার লঘু পদধ্বনি মৃদুশব্দে মিলিয়ে গেল। চমকে পেছনে তাকাল মাধব।

"কে !"

অস্ফুটকণ্ঠে গুণবন্তী বলল, "আমি !"

"গুণবন্তী ! এসেছ !"

জবাব না দিয়ে গুণবন্তী বসল।

মাধব বলল, "কি বলে এলে বাড়ি থেকে ?"

"মিথ্যে কথা বলে এসেছি।"

"সত্যি কথা বললে কী দোষ হত গুণবন্তী ?"

"সত্যের মর্যাদা লোপ পেত।"

"মিথ্যে কথা বললেও তো সত্যের মর্যাদাহানি হয়।"

গুণবন্তীর গলার মধ্যে তিক্ততা ধ্বনিত হয়, "তুমি লেখাপড়া জানা মাস্টার মানুষ, কথার প্যাঁচ দিয়ে আমাকে খোঁচা দিয়ে তোমার লাভ কি মাধবরাও? আমি আসাতে কি তুমি খুশি হওনি?"

দ্রুতকণ্ঠে মাধব বলল, "আমাকে ভুল বুঝো না গুণবন্তী, মাফ করো—আমার মাথার ঠিক নেই আজকাল"—

দু'জনেই চুপ করে রইল। তাদের নৈঃশব্দের ওপর সমুদ্র গর্জাতে লাগল, হালকা অন্ধকারের মধ্যে তাদের দেহরেখা অস্পষ্ট হয়ে এল।

মাধব বলল, "তোমায় দেখতে পাচ্ছি না গুণবন্তী"—

গুণবন্তী শুক্‌নো গলায় বলল, "আমায় না দেখলেই বা—আমি আছি।"

"গুণবন্তী"—

"কি?"

"এ কী হল?"

গুণবন্তী নড়ে উঠল, বলল, "জানি না।"

মাধব তাকাল তার দিকে, "আমি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না—কি করব তুমি বলে দাও।"

গুণবন্তী আবার বলল, "জানি না।"

"তুমি কি করবে গুণবন্তী?"

যেন অনেক দূর থেকে জবাব এল, "আমি ভাবিনি।"

মাধব বলল, "কিন্তু তোমাকে যে ভাবতেই হবে"—

"কি হবে ভেবে?"

মাধব বিস্মিত হয়ে বলল, "এসব কি বলছ গুণবন্তী!"

ধরা গলায় গুণবন্তী বলল, "তাছাড়া আর কী বলব? ভেবেই বা আমি কি করতে পারি?" শেষের দিকে তার গলা প্রায় শোনাই গেল না।

মাধব সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, "তুমি কাঁদছ গুণবন্তী!"

কাঁদতে কাঁদতে গুণবন্তী বলল, "কেন? কাঁদতেও পারব না বুঝি?"

হালকা অন্ধকারে ওপরে ছিটকে-ওঠা ঢেউয়ের জল দেখা যায়। বাতাসের ধাক্কায় জলকণা তাদের গায়েও ছিটকে আসে।

মাধব বলল, "গুণবন্তী—আমার জীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে",—

গুণবন্তী বলল, "আমারো"—

"কিন্তু এখনো সময় আছে—পথ আছে"—

"কিসের?"

"তুমি এসো"—

"কি বলছ তুমি!"

মাধব দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "তুমি আমার জীবনে এসো গুণবন্তী"—

গুণবন্তী বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল, বলল, "না।"

মাধবও উঠে দাঁড়াল, ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, "কিন্তু কেন? তুমি কি আমাকে ভালবাসো না?"

গুণবন্তী মুখ ফিরিয়ে বলল, "বাসতাম—"

"আর এখন?"

"আমি বিধবা।"

উত্তেজিত হয়ে উঠল মাধব, "তোমার বিয়েই হয়নি গুণবন্তী"—

"মাধবরাও!" গুণবন্তীর গলা কেঁপে উঠল।

মাধব তখন জ্ঞান হারিয়েছে, সে বলল, "তাছাড়া বিধবাদেরও তো বিয়ে হয় আজকাল"—

গুণবন্তী আবার তীব্রস্বরে বলল, "মাধবরাও—তুমি কি আমায় অপমান করার জন্যই ডেকেছ?"

"অপমান!"

"তা নয়তো কি ? তুমি কি জানো না যে, আমি হিন্দু বিধবা"—

"কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে—"

গুণবন্তী আবার বাধা দিয়ে বলল, "তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে চেও না মাধবরাও"—

"গুণবন্তী—শোন"—

"জোর করে আমার পেছনে পেছনে ঘুরে নিজের জীবনকে নষ্ট করো না, আর আমারও বদনাম করো না মাধব"—

"গুণবন্তী !"

"এই আমাদের শেষ দেখা।"

বলেই ছুটে চলে গেল গুণবন্তী। আর একবার ডাকতে গিয়ে মাধব দেখল যে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সমস্ত শরীরটা অসাড় হয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে সে উঠে দাঁড়াল। তখন সমুদ্রকে এক অখণ্ড অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। অশরীরী এক দৈত্যের মত গর্জাচ্ছে তা। আকাশে মেঘের দাপটে তারাদের আলো নিভে গেছে। উত্তর-পূব কোণের আকাশটা মাঝে মাঝে ক্ষীণ আলোর চমকে শিউরে শিউরে উঠছে আর বহুদূর থেকে মৃদু একটা গুম্‌গুম্ শব্দ ভেসে আসছে।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে মাধব এগিয়ে চলল। এ কোন্ ভূত চেপেছিল তার মাথায় ! এ কি করল সে—গুণবন্তীকে কোন্ সাহসে অপমান করল ! হিন্দুঘরের বিধবা মেয়ে ইহকালকেই তো শেষ কথা ভাবে না, শুধু দেহকেই তো পূজো করে না। কিন্তু তারই বা অন্যায় কি ? সে তো আজ ভালবাসেনি গুণবন্তীকে, সে তো একতরফা ভালবাসেনি। মাতাল, অর্থলোভী বাপের জবরদস্তিতে প্রৌঢ়, অতৃপ্ত-কাম এক দাদরের দোকানদার দুটো মন্ত্রের জোরেই কি সব কিছুকে মিটিয়ে দিতে পারে ? তাছাড়া সে তো দু-মাসেই মরে গেছে—তার

স্মৃতি সম্বল করে জীবন কাটাবার মত কিইবা পেয়েছে গুণবন্তী ? কিন্তু যাক্—ভেবে লাভ নেই—

এবার সে কি করবে ? কোন্ পথ ? কোন্ পথে এই জীবন সার্থক হবে, সফল হবে ?

সেই গুম্‌গুম্ শব্দটা যেন বাড়ছে প্রতি পদক্ষেপে। কান পাতল মাধবরাও। বাজারের দিক থেকে আসছে। মেঘগর্জন নয়। আরো এগোলে বুঝতে পারল সে। লাউডস্পীকারের শব্দ। কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে, কিসের বক্তৃতা ? বাজারের দিকে পা বাড়াল সে।

বাজারে গিয়ে দেখল বড় ভিড়। একটি বাড়ির বারান্দা থেকে বক্তৃতা দিচ্ছে তাদের পাড়ার নামজাদা জন-নেতা কালে। তার পেছনে একটা কাপড়ের ওপরে লেখা—'গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতি'। মাধব স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সে রাতে ঘুম এল না তার। মাথার মধ্যে একটা উত্তেজনা দপ্‌দপ্ করতে লাগল। দশ টাকার ঘরের অন্ধকারে বর্ষণ-মুখর গভীর রাতে সে আবার নতুন করে বুঝতে পারল যে এ জীবনে চেয়ে না পাওয়ার দুঃখ, অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা সব কিছুকে কাজের ভেতর দিয়েই কিছুটা ভোলা যায়। হতাশায় নুয়ে পড়ে লাভ নেই। ব্যক্তিজীবনের সার্থকতার পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক তার বেশীর ভাগই সমাজ ও রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণ গঠনের জন্য হয়। সুতরাং সেও কাজ করবে, হতাশায় যে কাজকে সে ইদানীং অবহেলা করেছে তা আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবে সে। তাছাড়া পুরো দেশ কি সত্যি স্বাধীন হয়েছে ? এতদিন যারা পরাধীন করে রেখেছিল, তাদের ইচ্ছেমত স্বাধীনতা পেয়েই আজ পাকিস্তান, আজ গোয়া, ডিউ, দমন। ফাঁকি দিয়ে তো কোন বড় কাজ হয় না।

*

গভীর রাতে, অবিশ্রান্ত বর্ষণের শীতলতা যেন মাধবের মনকে

প্রশান্ত করে তুলল। ফতিমা দেবী স্কুলের এক নগণ্য মাস্টার মাধব-রাওয়ের অচরিতার্থ ব্যক্তি-জীবন দেশ ও সমষ্টির সেবায় আজ থেকে নিযুক্ত হল। ভবিষ্যতের মাধবরাওদের সুখশান্তিই এখন থেকে তার লক্ষ্য।

একটা নতুন উত্তেজনা এল তার মনে।

ফতিমা দেবী স্কুলের শীলা, সরলা, অজিত আর বিক্রমদের মুখের ওপর সে এখন থেকে যেন নতুন কিছু দেখতে পেল। দেশ। ভবিষ্যতের মাধব আর গুণবন্তী। সে দেখল এই সব বালক-বালিকাদের মনের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলা। ইতিহাসের এক সন্ধি-ক্ষণের দিশেহারা ভাব। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, নীতির নামে দুর্নীতি, সভ্যতার নামে বিদেশী ভাব, শিল্পের নামে যৌন-উত্তেজনামূলক সিনেমার প্রচার—দেশের এই ভয়ানক মানসিকতাকে সে এইসব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুভব করতে পারল। সে ভয় পেল। এভাবে তো কোনদিন এদের সে দেখেনি, ভাবেনি।

সে উঠে পড়ে লাগল। নতুন উত্তেজনার জোয়ার এল তার রক্তের মধ্যে।

স্কুলের পর আবার সে পার্টির কাজে বেরোয়। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সে।

শহরের হাওয়ায় গোয়া সম্পর্কে উত্তেজনা। সারা ভারতবর্ষের উত্তেজনা এসে জড়ো হচ্ছে বোম্বাই শহরে। প্রবল বর্ষা সে উত্তেজনার আগুনকে নেভাতে পারে না, পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়া তার কাছে হার মানে। মাধবরাও সেই উত্তেজনাকে প্রাণভরে নিশ্বাসের সঙ্গে টানে।

সেদিন রাতে চিঞ্চোলির একটা সরু গলি দিয়ে বাড়ি ফিরছিল মাধব। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল যে সামনের একটা বাড়ি থেকে একজন

লোক টলতে টলতে বেরোল। বাড়িটা শান্তা বলে একটা খারাপ মেয়েলোকের।

টলতে টলতে লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মাধব এগিয়ে গিয়ে তুলল তাকে, তুলতে গিয়ে চিনতে পারল সে লোকটা হীরেকর। মুখ দিয়ে তার দেশী মদের অসহ্য ঝাঁঝালো গন্ধ।

"কে! ওঃ—মাধবরাও!" হীরেকরের নাড়ীজ্ঞান টনটনে। মাধবকে চিনেই সে অহেতুক ফোঁস্ করে উঠল।

মাধব এগিয়ে যাচ্ছিল।

হীরেকর হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল, "আমার মেয়েকে বিধবা করেও তোর আশা মেটেনি মাধবরাও—এ্যাঁ।"

মাধব দাঁড়াল, "এসব কি বলছেন আপনি—"

হীরেকর হাত নেড়ে টাল সামলে বলল, "আলবৎ—তুই-ই তো আমার জামাইকে মন্তর পড়ে মেরেছিস—"

"খবরদার হীরেকরজী—"

"তুই খবরদার মাধবরাও—খ-ব-র-দার—আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি কখনো দেখি—"

বাকীটা শোনার জন্য আর অপেক্ষা করল না মাধব।

বাড়ি গিয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল যে, প্রৌঢ় হীরেকর শুধু নেশা করেই শান্তি পাচ্ছে না, শান্তার বাড়িতেও যাতায়াত করছে। হীরেকরের এই অধঃপতন বিধবা গুণবন্তীর জীবনে যে কত দুঃখ টেনে আনবে সেই কথা ভেবে তার মনটা বেদনায় টনটন করে উঠল। আবার একটু বাদেই সে ভাবল, কেন এই দুঃখ! বিধবা গুণবন্তীর সঙ্গে তার তো কোন সম্পর্ক নেই—তার সম্পর্ক ছিল কুমারী গুণবন্তীর সঙ্গে, দাদারের এক অতি-সাধারণ প্রৌঢ় মৃত দোকানদারের বিধবা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভেবে কেন সে সময় নষ্ট করবে? যদি ভাবতেই হয় তাহলে অতীতের

একটি অনাঘ্রাত কুসুমের শিশিরস্নাত বর্ণ-সমারোহের কথাই না হয় ভাববে।

কিন্তু যার কথা আজকাল আর ভাববে না মাধব সেই বিধবা গুণবন্তীই সকালবেলা এসে হাজির হল।

রান্না চাপিয়ে দিয়ে দৈনিক 'লোকসত্ত্বা'টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল সে, হঠাৎ দরজাটা নড়ে উঠল। মুখ তুলে দেখল যে গুণবন্তী দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি এ সময়ে!"

গুণবন্তী মোড়াটা টেনে বসল, বলল, "এলাম।"

মাধব কাগজের দিকে নজর ফিরিয়ে বলল, "কিন্তু কেন?"

"আমার খুশি।"

মাধব জবাব শুনে না তাকিয়ে পারল না; "কিন্তু লোকনিন্দা?"

গুণবন্তী বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বয়ে গেছে—"

মাধব উনুনের আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু বয়ে যায়নি। কাল রাতে তোমার বাবা মদমত্ত অবস্থায় আমায় শাসিয়ে দিয়েছেন যে আমি যেন তোমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় না যাই—",

"তুমি তো যাওনি।"

"কিন্তু তুমি যে আমার বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে এসে বসেছ —সেটা তোমার বাবার কাছে আরো গুরুতর—"

"বাবা আজকাল বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছেন—শুধু মদ নয়"—গুণবন্তী বলতে বলতে থেমে গেল।

মাধব বুঝল, বলল, "আমি জানি।"

দুজনে হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেলল। গুণবন্তী বাইরের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল যে, একটা কাঠবেড়ালি আম-

গাছটার গা বেয়ে ওপরে উঠে গেল, একটা কাক ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ডেকে উড়ে গেল। মাধব দেখল যে ভাতের জল টগবগ করে ফুটছে, দেখল যে, উনুনের আগুনটা গনগনে হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেখাটাই ত শেষ কথা নয়। তাই সমস্ত দেখার অন্তরালে একটা তীব্র অনুভূতি পরস্পরের সান্নিধ্য সম্পর্কে পরস্পরকে সচেতন করে তুলল। ফলে গুণবতী লজ্জাবোধ করতে লাগল আর মাধবের মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল।

সমস্ত লজ্জাকে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসে তরলকণ্ঠে গুণবন্তী বলল, "আজকাল কি করছ মাধবরাও ?"

মাধব বলল, "পড়াই।"

"আর ?"

"রাজনীতি করি।"

"দেশ তো স্বাধীন, আবার রাজনীতি কেন ?"

"দেশ তো পুরো স্বাধীন হয়নি। হলেও কাজ বাকি থাকে! প্রথমে স্বাধীনতা জনে জনে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়—তারপর তা রক্ষা করতে হয়।"

"কিন্তু তোমার নিজের জন্য আর কি করবে মাধবরাও ?"

"কিছু না—তা সম্ভব নয়। আমার পথ এখন কর্মের পথ—কাজের ভেতরই আমার জীবনের সার্থকতা।"

গুণবন্তী কান পেতে কথাগুলো শুনল, তারপর মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "তোমার কিন্তু পথ আছে, কিন্তু আমার কি হবে তাই ভাবছি"—

মাধবের রক্ত যেন দুলে উঠল। হঠাৎ যেন একটি নিষ্ঠুর পীড়নের বাসনা তার মনে জাগল, ফস্ করে সে বলল, "তারপর কি আছে, তুমি তোমার মাতাল বাপের সংসারে দাসীগিরি করবে"—

কথার ধাক্কায় দু-হাতে মুখ ঢাকল গুণবন্তী।

কিন্তু বিচলিত হল না মাধব, দু-হাতে মুখ ঢেকে গুণবন্তী যে করুণ ছবির সৃষ্টি করেছে তা তাকে এতটুকুও বিচলিত করল না।

সে বলল, "সেদিন আমাকে নানা উপদেশ দিয়ে আজ আবার এখানে তুমি কি করে এলে গুণবন্তী? তোমার ভয় করল না?"

গুণবন্তী ধীরে ধীরে মুখ তুলল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "ভয়! কেন?"

মাধব পূর্ণদৃষ্টি মেলে গুণবন্তীর দিকে তাকাল, বলল, "যদি হঠাৎ তোমাকে ভালবাসার কথা বলতে শুরু করি"—

গুণবন্তী ভুরু কোঁচকাল, তারপর বলল, "তা হলে চলে যাব"—

মাধব বলল, "যদি হাত ধরে তোমাকে আটকাই?"

গুণবন্তী উঠে দাঁড়াল, বিষণ্ণ হেসে বলল, "তা তুমি পারবে না মাধবরাও—আমি জানি তুমি কোন অন্যায় কাজ করতে পারো না"—

মাধবের গলা কর্কশ হয়ে উঠল, "কেন পারব না—আজকাল অন্যায় করতেও পারি আমি। তা ছাড়া তোমার কাছে যেটা অন্যায় আমার কাছে সেটা অন্যায় নাও তো হতে পারে"—

গুণবন্তী দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরুল, বলল, "যাই"—

"দাঁড়াও"—মাধব উঠে ঘুরে দাঁড়াল।

দরজার ওপারে গুণবন্তী দাঁড়াল।

"কি?"

মাধবের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, পরিষ্কার গলায় সে বলল, "তুমি আর আমার এখানে এসো না গুণবন্তী"—

গুণবন্তী নড়ল না, মাধবের কথায় যেন কোন প্রতিক্রিয়াই হল না তার, শুধু কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে মাধবের দিকে তাকিয়ে, একবার মৃদু হেসে ধীরপদে চলে গেল।

মাধব গিয়ে খাটের ওপর বসল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল যে,

গুণবন্তী কি করে আজ মাথা এত ঠাণ্ডা রাখল ! কেন সে রাগল না ? কেন ? পোড়া ভাতের দুর্গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল ।

বিদেশী শক্তির ছোট ছোট ঘাঁটি । বর্বর জলদস্যুদের বর্ণশঙ্কর গেরস্থালী । সেখানে বহু অদৃশ্য শক্তির নিরবয়ব আস্তানা । বাগে পেলেই ভারতবর্ষের পেটে ছুরি মারার ঘাঁটি । তাই সেখানে শুল্কহীন সস্তা মদ আর বিলিতি মাল, পাশ্চাত্য ধরনের অবাধ যৌন-উদ্দামতা । সুতরাং অধিকাংশ গোয়ানীজের ঘোর আপত্তি স্বাধীন হতে । নিজেদের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তারা সুখী কুকুরের জীবনই পছন্দ করে, স্বাধীন মানুষ হতে চায় না । কিন্তু জাগ্রত ভারতবর্ষ তার সমর্থন করতে পারে না । তাই সীমান্তে সীমান্তে সত্যাগ্রহের মহড়া ।

পর্তুগীজ পুলিস আর নিগ্রো সৈন্যেরা তাই বান্দাতে সত্যাগ্রহীদের পিটিয়ে অজ্ঞান করে । তেরেখোল খাড়ি পার হয়ে পালিয়াতে, প্যাটেল ওয়াড়িতে, ক্যাসল্‌রকে, ভাপিতে, দিউ সীমান্তে, দমনে—একই ঘটনা ঘটতে থাকে । অত্যাচার ।

মাধবরাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়ে ।

স্কুলে ছাত্রদের সে উদ্বুদ্ধ করে দেশের কথা বলে । প্রতিটি ছেলে-মেয়ে মনে মনে স্বপ্ন দেখে যে তারা দেশের জন্য দরকার হলে প্রাণ দেবে ।

সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল, তাই স্কুল থেকেই সোজা বাড়ি ফিরল সে ।

এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে বসতেই জোরে বৃষ্টি নামল । মুষলধারে ।

দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল গুণবন্তী ।

"তুমি !" মাধব না বলে পারল না । শরীরটা তার শক্ত হয়ে উঠল ।

গুণবন্তী হাসল, বলল, "হ্যাঁ। আমি নিতান্তই বেহায়া"—বসল সে, জিজ্ঞেস করল, "কফি আরো আছে?"

"আছে।"

"আমায় একটু দেবে না?"

"দিচ্ছি।"

মাধব কফি দিল। গুণবন্তী মুচকি হাসল।

"হাসছ কেন?"

"এমনি। ভালো লাগছে—রাঁধুনীকে কেউ পরিবেশন করলে তারও আমার মত হাসি পাবে।"

মাধব কথা বলল না, নিঃশব্দে কফিটা শেষ করল।

গুণবন্তী নিজের কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "একটা কথা শুনবে?"

"কি?"

"তুমি বিয়ে কর এবার"—

নিজের কাপটা দেয়ালের গায়ে হঠাৎ সজোরে ছুঁড়ে মারল মাধবরাও, তারপর তাকাল গুণবন্তীর দিকে। গুণবন্তী মাথা নীচু করল।

বাইরে বৃষ্টির আলাপ জমে উঠেছে। খাড়ির দিক থেকে সমুদ্রের গর্জ্জনের শব্দ ভেসে আসছে।

গুণবন্তী আবার মুখ তুলল, দেখল যে মাধব তখনো তাকিয়ে আছে।

মাধব যেন গুণবন্তীর শুধু মুখচোখ দেখছে না, মর্মভেদী চাউনি তার যেন সে হৃদয়ের খবরও চাইছে। গুণবন্তীর শরীর কেঁপে উঠল। চোখ ফেরাতে গিয়েও চোখ ফেরাতে পারল না সে। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়েও সে পারল না। ছাদের পাইপ থেকে মোটা একটা জলের ধারা একটা বিচিত্র ছন্দে পড়ছে জানলার পাশে। সেই শব্দটা যেন ক্রমে আচ্ছন্ন করল গুণবন্তীকে।

মাধব উঠে দাঁড়াল। গুণবন্তীর দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে থেকে সে এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। গুণবন্তীও উঠে দাঁড়াল! অতি ধীরে। দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। মুখোমুখি দাঁড়াল। দুজনে দুজনের দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল। জলবৃষ্টির শব্দটা যেন একটা পাতলা পর্দা হয়ে তাদের মাঝখানে দুলতে লাগল।

হঠাৎ মাধব দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। লজ্জায়, আত্মধিক্কারে।

যখন মুখ তুলল তখন আর গুণবন্তীকে দেখতে পেল না সে।

তারপর থেকে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে শুরু করল সে। ভোরে উঠেই বেরিয়ে যায়—স্কুল, পার্টির কাজ সব সেরে ফেরে। খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বাইরেই করে। নিজের মনের বেআব্রু চেহারাটা দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে। গুণবন্তীর সঙ্গে আর দেখা না হওয়ার ব্যবস্থা করবে সে। গুণবন্তীকে দেখলেই এখন সব সঙ্কল্প গুলিয়ে যায়। হয়তো তাকে একদিন অপমান করার মত অধঃপতনও হতে পারে তার। না, তাকে সাবধান হতেই হবে।

এমনি সাবধানে চলতে লাগল সে এর পর থেকে। প্রায় দু-সপ্তাহ কেটে গেল। এই আত্মনিগ্রহে দুর্বল হয়ে পড়ল সে, তবু দমল না। মনকে বশ করবেই সে।

শনিবার দিন রাত প্রায় এগারোটার সময় বাড়ি ফিরল মাধব। তার হাতে একটা ফুলের মালা। সারা চিঞ্চৌলী পাড়াতে তখনই গভীর রাতের নিষুতি ছড়িয়ে পড়েছে।

তালা খুলে ঘরের আলো জ্বালতেই দরজার গোড়া থেকে কে যেন বলল, "এত দেরি করে এলে!"

বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল মাধব। গুণবন্তী!

দরজাটা ভেজিয়ে গুণবন্তী ভেতরে এসে দাঁড়াল।

মাধব অবাক হয়ে বলল, "এত রাতে এলে কি জন্যে?"

গুণবন্তী মৃদুকণ্ঠে বলল, "এত রাতে তো আসিনি—এসেছি সেই বিকেলে—তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—"

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"খাড়ির ধারে"—

"কিন্তু বাড়ি"—গুণবন্তী বাধা দিয়ে বলল, "আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি"—

বুঝতে পারল না মাধব, "কি বলছ তুমি! তার মানে?"

গুণবন্তী মাথা নীচু করল, "আমি আর বাড়ি ফিরব না"—

"কেন?"

"বাবা আজ সকালে শান্তাকে বাড়িতে এনে বসিয়েছেন"—

"শান্তা!"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি—তুমি এখন কোথায় যাবে?"

গুণবন্তী মুখ তুলে তাকাল, ধীর গলায় বলল, "তোমার কাছে যাব বলেই তো ঘর থেকে বেরিয়েছি"—

মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেল মাধব, বিস্ময় বিমূঢ় চোখে গুণবন্তীর দিকে চেয়ে রইল। কথাটা যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না তার কিংবা সে যেন ভুল শুনেছে। প্রায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "আমার কাছে!"

গুণবন্তী বলল, "আমাকে তোমার এই ঘরে ঠাঁই দাও—আমি আজ সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে—"

"কিন্তু গুণবন্তী—"

গুণবন্তীর গলাতে যেন জোর এল, সে বলল, "আমি মেয়েলোক, তোমাদের মত এক দিনেই তো সব অমান্য করতে পারি না। মাধব,

একবার কুঙ্কুমের টিপ আমার জীবনে অভিশাপ হয়ে এসেছিল—এবার তুমি তা আমার সৌভাগ্য-চিহ্ন করে তোল—"

মাধব দেয়ালে ঠেস দিল, তার চোখে জল এল।

গুণবন্তী ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "কাঁদছ !"

মাধব বলল, "হায় গুণবন্তী, তুমি যদি আর দু-দিন আগেও আসতে"—

"কেন ? কি হয়েছে ?"

মাধব চোখের জলের ভেতর দিয়ে তাকাল, বলল, "আমি গোয়া-সত্যাগ্রহে নাম লিখিয়েছি—পরশু দিন সকালে আমি বেলগাঁও যাচ্ছি, তার পরদিন পনরই আগস্ট সকালে আমি গোয়ার সীমান্ত পার হব"—হাতের মালা তুলে সে বলল, "আজ এক সংবর্ধনা-সভায় সত্যাগ্রহী হিসেবে দেশ আমাকে এই মালাও পরিয়েছে—"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে গুণবন্তী বলল, "কেন এ-কাজ করলে মাধব ?"

মাধব বলল, "জীবনে গৌরবের মত কিছু না থাকায় যে তা বোঝা হয়ে উঠেছে গুণবন্তী—"

গুণবন্তী হাসল, "বেশ তো যাও না—আমি তাতে বাধা দেব না—"

"কিন্তু যদি ফিরে না আসি ? ওরা এবার গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছে—"

"নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর ওপর গুলি চালাবে ! না—না—"

"যদি চালায় ? দুজনকে তো কিছুদিন আগে মেরেছে—"

"না না, চালাবে না, অত সাহস হবে না ওদের ! মাধবরাও, আমাকে আর নির্লজ্জ করো না। বাঁচতে দাও, এই ঘরের ঘরণী হতে দাও—"

"কিন্তু পরশু সকালেই যে আমি যাব গুণবন্তী—"

"তাহলে কালই আমাদের বিয়ে—"

"আর আজ?"

"আজ অধিবাস—"

"কিন্তু তোমার বাবা?"

"একবার খুঁজে গেছে—আর আসবে না—"

"যদি আসে?"

"আসবে না, শান্তা কাঁচা মেয়েলোক নয়।"

"কিন্তু আমার এখানে দুঃখই পাবে তুমি—আমার আয় তো বেশী নয়—"

"আমিও রোজগার করব মাধব—তুমি ভেবো না—"

হাতের মালা গুণবন্তীর গলায় পরিয়ে দিয়ে মাধব বলল, "তাহলে এসো আমার জীবনে—" গুণবন্তীকে হাত ধরে বসাল মাধব। বৃষ্টির শানাই মাঝ রাতে আরো জমে উঠল, কোলাব্যাঙেরা পোঁ ধরল। দূরবর্তী সুবারবান রেলপথ থেকে রাত একটার শেষ ইলেকট্রিক ট্রেনটার বাঁশীর শব্দ যেন বহুদূরবর্তী শঙ্খধ্বনির মত শোনাল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল ওরা। মাধব আর গুণবন্তী! একজন একজনকে দেবতা ভাবল, একজন একজনকে দেবী ভাবল। আগামী কাল জীবনে যে বিচিত্র ব্রত আসছে তারি জাগ্রত-স্বপ্ন দেখতে দেখতে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেয়েছি—এই অনুভূতির কী আশ্চর্য মাদকতা!

ভোর হবার আগেই বেরোল দু'জনে। নইলে হয়তো হীরেকরের হিংস্রতার সামনে পড়তে হবে। তখন বৃষ্টি থেমেছে। শান্ত চিঞ্চোলীর রাস্তাতে যেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের আসন্ন ক্ষীণ আভা। হাত ধরাধরি করে দু'জনে চলল।

ট্রেনে চড়ে সোজা বোম্বাই। মেরিন ড্রাইভে আর গেটওয়ে-অব-

ইণ্ডিয়ার ধারে ধারে বেড়িয়ে বেলা হল। বাজার থেকে নতুন শাড়ী কিনল মাধব, মঙ্গলসূত্র আর কুঙ্কুম কিনল, সোনালী কাজ-করা চুড়ি আর জরির সুতো দিয়ে মোড়া রজনীগন্ধার বেণী কিনল! তারপর সোজা আর্য-সমাজে। বিয়ে শেষ হতে বিকেল হল।

জুহুর সমুদ্রতীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে গেল তারা। বসল সমুদ্রের ধারে। হাতে হাত রেখে—তুটো আকুল সমুদ্রের ঢেউ যেন তুজনের হাতের বন্ধনে এসে আঘাত করতে লাগল।

বৃষ্টি এল। ওরা পালাল। সোজা একটা হোটেলে গেল। খেল, তারপর রাস্তায় রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে লাগল। এলোমেলো কথা বলল, অকারণে হাসল, থেকে থেকে থেমে পড়তে লাগল, আর ল্যাম্প-পোস্টের আলোর তলায় মাঝে মাঝে যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হতে লাগল তাদের।

তারপর রাত একটার সময় চিঞ্চোলী ফিরল তারা। সোজা রাস্তা এড়িয়ে, ঘুর-পথে, লোক চক্ষুর অন্তরাল দিয়ে।

ঘরে ঢুকেই গুণবন্তী গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, "কাল ক-টায় গাড়ি ?"

"সকাল আটটায়—"

গুণবন্তী বিছানায় মুখ গুঁজে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল, বলল, "ক-দিন বাদে যেও—"

মাধব চমকে উঠল, বলল, "ছিঃ গুণবন্তী, আমার পৌরুষকে হরণ করতে চাও তুমি।"

গুণবন্তী কাঁদতে লাগল। দশ টাকার ঘরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, মাঝ রাতের ইন্দ্রজাল যেন একটি নারীর কান্নায় আরো ঐন্দ্রজালিক হয়ে উঠল। মাধব দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর কান্না থামাল গুণবন্তী, চোখ মুছে উঠে বসল, বলল,

"আমায় মাপ করো—আমি তোমার যোগ্য নই—আমি বড় লোভী—"

মাধব ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেল। গুণবন্তীর পাশে বসে সে তার মুখটা তুলে ধরল, গুণবন্তী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। এতদিনের আকুলতার শেষ হল। দশ টাকার ঘরটা মিলিয়ে গেল, আকাশের তারারা নিভে গেল, নারকেল-বনের মর্মরধ্বনি থেমে গেল। সমুদ্র স্থির হয়ে গেল, দুটি মানুষের চৈতন্যের মাঝে একটি পবিত্র প্রদীপের শিখা জ্বলে উঠল।

ভোর আটটায় ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে গাড়িতে চড়ল মাধব। সব মিলিয়ে প্রায় একশ জন সত্যাগ্রহী স্টেশনে। গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতির একদল কর্মী তাদের জয়ধ্বনি করল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাধবরাও বলল, "কেঁদো না"—

গুণবন্তী বলল, "আমার কান্না দেখে তুমি মন খারাপ করো না—কেঁদে মনটা হাল্‌কা করে নিচ্ছি—"চোখ মুছে সে পরে বলল, "তোমায় ফিরে আসতে হবে—"

মাধব বলল, "আসব—কিন্তু এ ক'দিন তোমার যে কি হবে—"

গুণবন্তী বলল, "ভেবো না—পুলিস নিয়ে এলেও তো বাবা আর কিছু করতে পারবে না"—

তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল।

সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি তুলল, "চলো চলো—গোয়া চলো"—

গুণবন্তীর চোখের জলের ভেতর দিয়ে ট্রেনটা মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ী পথ। টানেল। ট্রেন ছুটে চলল। মাধবের রক্তে গতি

ছড়াতে লাগল। আশ্চর্য, জীবনদেবতা শেষ পর্যন্ত সব একসঙ্গে এনে দিল তাকে।

এই কামরার মধ্যে আরো বারোজন সত্যাগ্রহী। বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এর লোক। পুণাতে আরো সত্যাগ্রহী উঠল। প্রায় তিনশ। একদল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা তাদের খাবার দিয়ে গেল। তাদের অপরিচিত মুখে অতি পরিচিত দেশ। তাই আলাপের দরকার নেই, তাই সবই সহজ।

পুণা পার হল। বেলা চড়ল। বিকেল হল। অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে আলাপ হল। সবাই মধ্যবিত্ত, গরীব ঘরের। জীবনের ব্যর্থতাকে একটি চরমক্ষণে গৌরবান্বিত করতে চলেছে।

আলাপ হল তাদের সঙ্গে। গোয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। দেশ চায় গোয়া ফিরে পেতে। সরকারও চান গোয়া ফিরে পেতে, কিন্তু সরকার বিশ্ব-রাজনীতিতে নাম কেনার পর বদনাম হতে চান না। সুনাম বজায় রাখার জন্য তাঁরা এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থনও করছেন না। ফলে পর্তুগীজ-পুলিস নির্বিচারে, নিঃশঙ্কচিত্তে সত্যাগ্রহীদের পিটিয়ে অজ্ঞান করছে। এবার হয়তো গুলিও চলবে। আলোচনা শুনতে শুনতে সাতারা রোড পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল ভরগাঁও, ভবানীনগর, মিরাজ জংশন, পচ্ছাপুর। রাত হল। বেলগাঁও এসে গেল—রাত এগারটায় লোণ্ডা জংশনে নামতে হল। এখান থেকে বাসে করে ক্যাস্‌ল্ রকে পৌঁছে ভোরবেলায় গোয়া সীমান্ত পার হতে হবে।

ক্যাস্‌ল্ রকে পৌঁছতে রাত দেড়টা বাজল। ব্যারাকের মত কতকগুলি কুঁড়েঘর মত তৈরি হয়েছে সেখানে, আর কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। অন্তত দু-হাজার সত্যাগ্রহী আগেই এসে জড়ো হয়েছে। মাধবেরা এল চারশ জন। স্বেচ্ছাসেবক

সেবিকারা এসে অভ্যর্থনা জানাল। শুকনো রুটি আর একটু করে তরকারী খেতে দিল তাদের। পনেরই আগস্টের ভোর ছ-টায় যাত্রা।

কিন্তু হাওয়ায় কি যেন থমথম করছে। অনেক দূরে, গোয়ার মাটিতে এখানে ওখানে বিন্দু বিন্দু আলো। পর্তুগীজ সৈন্যদের প্রস্তুতি। এদিকে সত্যাগ্রহীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখ। একটা সাংঘাতিক কিছু হবে।

একটা পেট্রোম্যাক্সের কাছে গিয়ে বসল মাধবরাও। হঠাৎ কালকের শেষরাত্রির কথা মনে পড়ায় বুকটা আলোড়িত হয়ে উঠল। কাগজ আর কলম বের করে সে হঠাৎ চিঠি লিখতে বসল।

সে লিখল ঃ

আমার গুণবন্তী,

আমি নিরাপদে সীমান্তে পৌঁচেছি। আজ সারাদিন তোমার কথা যে মনে পড়েছে সে কথা বিস্তৃতভাবে বলে আর তোমার দুঃখ বাড়াতে চাই না। এখন শেষ রাতের পবিত্র প্রহরেও তোমার মুখ ভেবেই এই চিঠি লিখছি।

চিঠি লিখছি এই ভেবে—যদি দেখা না হয়। দূর থেকে তো সব বোঝা যায় না। সত্যাগ্রহও এক রকমের যুদ্ধ। যুদ্ধে যে অস্ত্রের ব্যবহারই হোক না কেন তাতে প্রাণকে বাজি রাখতেই হয়। আজ এখানকার হাওয়াতে সেই ঘোষণাই শুনতে পাচ্ছি। গুণবন্তী, যদি মরি, দুঃখ করো না। তোমাকে পেয়েছি, আজ কর্মের পথ আমার কাছে আর দুর্গম নয়। শুধু প্রেমের তো কোন দাম নেই গুণবন্তী। তোমার স্বামী তোমার আঁচল ধরে হীন একটা জন্তুর মত দিন কাটালে তোমার গৌরব তো বাড়বে না। যদি ফিরে আসি, তাহলে দুঃখের কথাই ওঠে না, যদি মরি তাতেও তোমার দুঃখ করার নেই। দেশের জন্য মরলে

তোমার কুঙ্কুমের টিপ উজ্জ্বলই হবে। তবু—তবু আমি ফিরে আসবার চেষ্টাই করব। সাবধানে থেকো গুণবন্তী।

ইতি তোমার মাধব।

খামের ওপর মাধব লিখল—শ্রীমতী গুণবন্তী দেওগিরিকর। তারপর খাম বন্ধ করে পকেটে রেখে চোখ বুজল সে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় তন্দ্রা এল তার। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল যেন গুণবন্তী তাকে একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল একটা ব্যস্ততার শব্দে। সত্যাগ্রহ-শিবির থেকে বিউগল্ বাজছে। তৈরি হও।

ব্যস্ততা। প্রস্তুতি। সারি বেঁধে দাঁড়ানো। নাম ধরে ডাক। আজকের নেতার নির্দেশ। একটা পতাকা এল মাধবের হাতে, সবার সঙ্গে সেও চিৎকার করল, "গোয়া ভারত এক হ্যয়—"

কিন্তু চিঠিটা যে পোস্ট করা হল না। চিঠিটা!

কে যেন বলল, "সালাজার কুইট্ গোয়া"—

কে যেন বলল, "পনরই আগস্টের পবিত্র প্রভাত শুরু হল—চল ভাইসব, তস্কর ভাস্কো-ডা-গামার অত্যাচারের দুর্গে আমাদের ভারত-মাতার পতাকা তুলে ধরি"—সবাই চেঁচাল, "চলো চলো—গোয়া চলো..."

কে ভারতবর্ষ? তার মা? গুণবন্তী? ফতিমা স্কুলের শীলা, সরলা, অজিত ও বিক্রমেরা?

পঞ্চাশ জনের একটা দলের মধ্যে মাধবরাও পড়ল। তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করবে।

"ভাইয়োঁ—তৈয়ার হো?" দলপতির ডাক এল।

"তৈয়ার"—সবাই বলল।

দলপতি আদেশ করল, "আগে বাঢ়ো"—

তিনজন করে এক এক সারিতে। সামনে দলপতি অনন্ত মারাঠে তার পেছনে পতাকাবাহী হল মাধবরাও। কে যেন গাইল, "বন্দেমাতরম্"—

তাদের গান শুনে, গাছের ডালে পাখীরাও কিচির-মিচির করে উঠল।

তাদের দলের পতাকাগুলো হাওয়ায় উড়তে লাগল। দশ মিনিট চলার পর গোয়ার সীমান্ত এল। দলপতি হাঁকল, "পর্তুগীজ"—

দল ঘোষণা করল—"কুইট গোয়া"—

সীমান্ত অতিক্রম করল তারা। পর্তুগীজের রাজ্যে ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়ল।

একটা ছোট মাঠের ভেতর দিয়ে, সরু একটা পায়ে-হাঁটা ভিজে ভিজে পথ ধরে সত্যাগ্রহীরা এগোতে লাগল। হঠাৎ দূরে দশজন পর্তুগীজ সৈনিককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের হাতে রাইফেল।

সত্যাগ্রহীরা ধ্বনি তুলল, "ভারত-মাতাকী জয়"—

পর্তুগীজ সৈন্যেরা বলল, "হল্ট—রোকো"—

তার এক মিনিট বাদেই তারা গুলি ছুঁড়ল।

মাধবরাওয়ের বাঁ পাঁজরায় পর্তুগীজের গুলি লাগল। সরু পথটির উপর পড়ে গেল সে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সে অনুভব করল যে, রক্তের ধারায় বুকটা ভিজে যাচ্ছে আর পেছনের সত্যাগ্রহীরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে অনুভব করল যে, তার সমস্ত চৈতন্য একটা বাঁধভাঙা স্রোতের মত যেন তার ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে সব কিছুই ক্রমে ফতিমা দেবী স্কুলের কালো একটা ব্ল্যাকবোর্ড হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার শেষবার মনে পড়ল যে, গুণবন্তীকে লেখা চিঠিটা আর এ জীবনে পোস্ট করা হল না।—

চিঠিটা গুণবন্তী আর পেল না। কিন্তু খবরের কাগজে পরদিন সে মাধবের নাম দেখে সব জানতে পারল।

শোকাতুর শহর তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। জনসমুদ্র উতরোল। বাতাসে উত্তেজনা আর প্রতিহিংসার শপথ।

অনেকক্ষণ পাথর হয়ে বসে রইল গুণবন্তী। তারপর হঠাৎ আরশিটা সামনে টেনে কুঙ্কুমের টিপ পরতে পরতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'না—আমি আর বিধবা হব না।'

রক্তের মধ্যে এক নতুন প্রাণের বীজ যেন পাখা মেলছে। তার বিচিত্র মাদকতায় সে তার ভবিষ্যৎকে একটি আলোকজ্জ্বল পথের মত নিজের সামনে প্রসারিত দেখতে পেল।

মৃদুকণ্ঠে আবার সে বলল, "আমি পথ খুঁজে পেয়েছি।"

অশরীরিণী

আমি তার কথা ভুলতে পারি না।

সমাজ সংস্কার মানুষের ভালবাসার বাঁধা রীতি, বাঁধা নীতি—আমি ওসব কিছুই মানি না বলে তাকে আরো ভুলতে পারি না। কাজে অকাজে তার মূর্তি নিত্য আমাকে প্রেতিনীর মত অনুসরণ করে, তার স্মৃতি আমাকে অহরহ তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি পোড়ায়। সে আমাকে ভালবাসেনি, কিন্তু আমি তাকে ভালবেসেছি।

তোমরা হয়ত ভাবছ যে আমি আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছি। না না, আমি সত্যি কথাই বলছি। প্রায়-অবিশ্বাস্য, প্রায়-অবাস্তব কিন্তু সত্য। শোন :

প্রায় তিন বছর আগেকার কথা।

মে মাসের একটি সন্ধ্যায় দাদারের একটি এলাকায় আমি শেখরের বাসার খোঁজ করছিলাম। শেখর আমার বাল্য-সুহৃৎ। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তুমকা থেকে। সাত বছর আগে—সেই যেবার ও এম-এ পড়তে কলকাতা চলে গেল। দু' তিন বছর চিঠিপত্র চলেছিল, তারপর যা হয়। সময় আর দূরত্ব বড় বন্ধুত্ব, বড় প্রেম আর বড় শোককেও ঝাপ্‌সা করে তোলে। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। মাঝে একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে,শেখর নাকি কোন এক পাবলিসিটি ফার্মে ভালো চাকরি করছে। কিন্তু বিস্তৃত খবর নেবার আর অবকাশ পাইনি। এক ওষুধের কোম্পানির চাকরি নিয়ে আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে, ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বোম্বাই হেড অফিসে যখন ভ্রাম্যমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেলাম তখন এক বন্ধুর চিঠিতে জানতে পারলাম যে শেখর সপরিবারে বোম্বাইতেই আছে।

বাসাটা খুঁজতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। বোম্বাই শহরের পুরনো বাড়িগুলো কোন নম্বরে বিশ্বাস করে না। তার বদলে তাদের নাম থাকে। শেখরের বাড়ির নামটা বেশ জমকালো—'অমৃত-ভুবন'। কিন্তু নাম থাকা সত্ত্বেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হয়ত ফিরেই যেতাম, কিন্তু শেখরের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেমন যেনএকটা জেদে চেপে গিয়েছিল, তাই হার মানলাম না। শেষ পর্যন্ত যখন 'অমৃত-ভুবন' খুঁজে পেলাম তখন মনে হল যে চতুর্দশ ভুবন পেরিয়ে এসেছি।

শেখরের ফ্ল্যাটে পৌঁছুলাম।

বহুক্ষণের অসহিষ্ণুতাকে কড়ার ওপর সবলে প্রয়োগ করলাম।

দরজা খুলে গেল। কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। ভেতর থেকে এক টুকরো আলো এসে বাইরে পড়েছিল। মনে হল তা যেন মেয়েটিরই অঙ্গ-জ্যোতি। রূপসী বলতে সাধারণত যা বোঝায় সেদিক থেকে মেয়েটি মোটেই নিখুঁত নয়। কিন্তু তবু তার ঈষৎ-কৃশ দেহলতার কোমল রেখাটুকু, তার গভীর কালো চোখের রহস্যময় চাউনিটা কেমন যেন ভালো লাগল।

"কাকে চান?"

শেখরের নাম করতেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

বললাম, "আমার নাম বিনয় দত্ত—আমি শেখরের বাল্যবন্ধু।"

"চিনেছি। আসুন—"

চিনেছি মানে? অবাক হয়ে মেয়েটির অনুসরণ করলাম।

করিডোর দিয়ে এগিয়ে সামনের একটি মাঝারি সাইজের ঘরের ভেতর ঢুকে মেয়েটি বলল, "ওই যে জামাইবাবু।"

স্তূপাকার বই ও কাগজের মধ্যে শেখর ডুবে ছিল, মেয়েটির গলা শুনে মাথা তুলল। মুহূর্তকাল বিহ্বলের মত সে তার ভাসা-ভাসা

কবি-দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরেই উঠে দাঁড়াল, ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, "বিনু !"

তার গলার অস্বাভাবিক আওয়াজে ভেতর থেকে একটা বিবাহিতা স্ত্রীলোক ছুটে এল। চারুদর্শনা। শান্ত স্নিগ্ধ তার ব্যক্তিত্ব।

তাকে দেখেই শেখর বলল, "মল্লিকা—এই হচ্ছে বিনু—আমাদের বিনয়।"

মল্লিকা দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে হাসল। বুঝলাম যে সে শেখরের স্ত্রী।

শেখর আমার হাত ধরে বসাতে বসাতে বলল, "আজ এখানেই থাকতে হবে বিনু—সারা রাত গল্প করব—কেমন ?"

এক কথায় রাজী হলাম।

শেখর বলল, "আরে দাঁড়া, আমার সইয়ের সঙ্গে তোর পরিচয় করালাম না"—

"সই কে ?"

শেখর হাসল, "ঐ যে—যে তোকে ভেতরে নিয়ে এল—চিন্ময়ী ওরফে চিনু ওরফে যা সেই শব্দটিতে ওর ঘোর আপত্তি বলে বাধ্য হয়ে সই বলি।"

শেখরের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে আমার দিকে তাকাল চিনু, হেসে বলল,"আপনি আসাতে আমরা বাঁচলুম বিনয়বাবু।"

"কেন বলুন তো ?"

"আপনার বর্ণনা শোনা এবার একটু কমবে—উঃ বাবা—বাড়িতে থাকলেই হল জামাইবাবুর—বিনু এই করত, বিনু এই বলত, বিনু এইভাবে একজনের সঙ্গে মারামারি করেছিল, বিনু এই পার্ট করেছিল, বিনু বড় জেদী আর অভিমানী, বিনু বিনু বিনু—আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে বিনু কখনই বিনয় নয়, নিশ্চয়ই সে বিনোদিনী।"

শেখর ও আমি হেসে উঠলাম।

মল্লিকা ভৎর্সনার সুরে বলল, "এই চিনু—"

চিনু বলল, "মাপ করবেন বিনয়বাবু—বাচাল বলে আমার একটু বদনাম আছে।"

শেখর বলল, "পরম সত্য কথা—হে সত্যভাষিণী, যদি তোমার বাচালতা-দোষ খণ্ডন করতে চাও তো দিদির সঙ্গে বসে বিনুর জন্য ঝট্‌পট্‌ চা আর জলখাবার তৈরি করে আনো—"

"যথা আজ্ঞা স্যর সত্যমুগ্ধ—চলরে দিদি—"

দুই বোন হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল।

আমাদের আড্ডা জমে উঠল। মনে হল যেন বোম্বাইয়ের প্রাণহীন আবহাওয়ার মধ্যে দুমকা-শহরের হারানো দিনগুলো আবার উড়ে ফিরে এল। পাবলিসিটির কাগজের স্তূপকে শেখর মুহূর্তে ভুলে গেল। আমি আমার পাঞ্জাবী হোটেলের কথা ভুলে গিয়ে বেপরোয়াভাবে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে এলোমেলোভাবে অতীতের ছোটবড় ঘটনা তুলে ধরতে লাগলাম। খাবার এল, চা এল। মল্লিকা আর চিন্ময়ী এসে কাছাকাছি বসল। আমাদের চারদিকে অজস্র ও অর্থহীন কথার ঝরনা কলকল শব্দে চারদিকে বয়ে চলল।

হঠাৎ শেখর প্রশ্ন করল, "বিয়ে করেছিস?"

মাথা নেড়ে বললাম, "মনোমত পাত্রী পাইনি।"

"সে আবার কি কথা!"

"জানিসই তো আমার রুচি আলাদা—বৌদি মাপ করবেন—আমার কাছে শুধু বহিরঙ্গটাই বড় কথা নয়, মনকে স্পর্শ করে এমন মেয়ে এখনো পাইনি।"

চিনুর হাসি শুনে তাকালাম, প্রশ্ন করলাম, "আপনার কি আমার কথা শুনে হাসি পেল?"

চিনু বলল, "পেল। আমার বাচালতা মাপ করুন বিনয়বাবু—না হেসে পারলাম না, আপনার কথাগুলো বেশ কাব্যি কাব্যি লাগছিল।"

মল্লিকা ধমক দিল, "এই চিনু—"

চিনুর ব্যঙ্গে একটু খোঁচা লাগল। সেই খোঁচা যেন চিনুর দিকে নতুন চোখে চাইতে বাধ্য করল আমায়। মন বলল, একটু নজর রেখো এই প্রগলভার ওপর। হয়ত তোমার অন্বেষণের সমাপ্তি ওর ওই কালো গহনেই ঘটতে পারে। মনকে বললাম, তথাস্তু।

কিন্তু আপাতত যে কথাটা ঘোরাতে হয় তাই বললাম, "তুই কবে বিয়ে করলি সেই কথা বল্ শেখর—বৌদি কোথাকার মেয়ে?"

"কলকাতার।"

চিনু বলল, "প্রথমে ঢাকার, পার্টিশনের পরে কলকাতার।"

শেখর বলল, "জানিস—মল্লিকা বামুনের মেয়ে—"

"বটে!"

মল্লিকা বলল, "বুঝলি চিনু, অব্রাহ্মণেরা এবার ব্রহ্মণ্য-গৌরবকে হৃতমান করার কাহিনী আলোচনা করে উৎকট আনন্দ উপভোগ করবে।"

চিনু উঠে বলল, "ধিক্ অব্রাহ্মণদের। চল্‌রে দিদি, আমরা রান্নাঘরে গিয়ে এই উদ্ধত ও বলগর্বী ক্ষত্রিয়দের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করি।"

"তাই চল্।"

ওরা গেলে শেখর বলল তার বিয়ের গল্প।

শেখরের বাবার বন্ধু ছিলেন মল্লিকার বাবা। শেখর যখন এম-এ পড়তে কলকাতা গেল তখন বৃহৎ সংসারের ভারে ক্লিষ্ট বাপকে দেখে সে ঠিক করল যে নিজের খরচ সে নিজেই চালাবে। একটা মাস্টারী

সে যোগাড় করেও নিল। মাতৃহীনা মল্লিকা ও চিন্ময়ীর বাবা তা জানতে পেরে বন্ধুর ছেলেকে ডেকে তুই মেয়ের পড়ার ভার দিলেন। মল্লিকার বয়স তখন সতরো, সে আই-এ পড়ছে। চিনুর বয়স তেরো, সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে।

পড়াশোনা চলতে লাগল। পিতৃবন্ধুর বাড়িতে শেখরকে কেউই গৃহশিক্ষক বলে মনে করত না। সে যেন বাড়িরই একটি ছেলে। শাস্ত্র ও সমাজ মতে শেখর আর মল্লিকার সম্পর্ক গুরু-শিষ্যার হলেও কিন্তু তারা আইন-ভঙ্গ করল। পাঠ্য-পুস্তক পড়াতে পড়াতে গৃহশিক্ষক শেখর একটি যুবতী-চিত্তের দুর্বোধ্য রহস্যলিপির পাঠোদ্ধার করল এবং ছাত্রী মল্লিকা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হচ্ছে শেখর এবং সে তার জন্যে জাতি কুল মান সব কিছুই অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত। যখন দুজনেই দুজনের কাছে হৃদয় মেলে ধরল, তখন এম-এ পাশ করে শেখর চাকরির চেষ্টা করছে এবং মল্লিকা আই-এ পাশ করেছে। ইতিমধ্যে প্রেমের লক্ষণ বাহ্যত প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রেম নাকি খুনের মতই সাংঘাতিক ব্যাপার—আত্মগোপন করতে পারে না। সুতরাং শেখরের শিক্ষকতা-পর্বের ও মল্লিকার ছাত্রী জীবনের সমাপ্তি ঘটল। শেখর মল্লিকাকে বিয়ে করতে চাইল। মল্লিকার বাবা উত্তেজিত হয়ে তারযোগে বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন। শেখরের বাবা এসে ও সব শুনে বিশ্বাসভঙ্গের গ্লানি বোধ করলেন। তিনি ছেলেকে তিরস্কার করলেন ও ভয় দেখালেন। মল্লিকাদের বাড়ি শেখরের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে উঠল। কিন্তু শেখর আর মল্লিকার দুঃসাহসকে কোন নিষেধই ব্যর্থ করতে পারল না। দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে লাগল এবং এবিষয়ে সাহায্য করতে লাগল চিনু। তেরো থেকে সে এখন সতরোর পূর্ণতায় এসে পৌঁছেছিল। ওদিকে মল্লিকার বিয়ের তোড়জোড় শুরু হল। ঠিক

যেমনটি হয়। মল্লিকা শেখরকে চিন্তাগ্রস্ত হতে নিষেধ করল, কারণ কেরোসিন কিংবা বিষের অভাব নাকি বাংলাদেশে নেই। শেখর মরিয়া হয়ে উঠল। আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ এক গুজরাটি বন্ধুর সাহায্যে বোম্বাই শহরের এক পাবলিসিটি ফার্মে তার চাকুরি ঠিক হয়ে গেল। কিছুদিন পরই বাড়ি থেকে উধাও হল মল্লিকা। এক বামুন পণ্ডিতের ওখানে লুকিয়ে দু'তিনজন বন্ধু সাক্ষী রেখে মল্লিকাকে বিয়ে করে শেখর পরদিনই সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করল। মল্লিকার বাবা পরদিন কুলত্যাগিনী কন্যার চিঠি পেলেন। মল্লিকা জানিয়েছে যে সে সাবালিকা। স্বেচ্ছায় ভালবেসে যোগ্য পুরুষকে বিয়ে করেছে, সুতরাং বাবা যেন থানাপুলিস ছেড়ে দিয়ে প্রসন্নচিত্তে তাদের আশীর্বাদ করেন। বলা বাহুল্য থানাপুলিসে দৌড়োদৌড়ি বন্ধ করলেও মল্লিকার বাবা মেয়ে জামাইকে ক্ষমা করলেন না।

বোম্বাই গিয়ে জীবনের সেই নূতন-পর্বে শেখর নাকানি-চোবানি কম খেল না। কিন্তু মল্লিকা এতটুকুও নিরাশ হল না, হাসিমুখে সে স্বামীর সঙ্গে সমস্ত কষ্ট সহ্য করল। প্রেম যখন উৎসাহ যোগায় তখন মানুষ সব পারে। সুতরাং তাদেয় জয় হল। যোগ্যতাবলে শেখর উন্নতি করল, ভাল ফ্ল্যাট পেল, রুষ্ট পিতাকে নিয়মিত সাহায্য করে প্রায়-নরম করে আনল। কিন্তু মল্লিকার বাবার রাগ এক তিলও কমল না। সেই রাগ পুষে পুষে তিনি তাঁর অকালজীর্ণ দেহকে আরো অকালে ক্ষয় করে তিন বছর বাদে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বিয়ের পর সেই প্রথম শেখর মল্লিকাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল। শ্বশুর কিছুই রেখে যাননি। কাকা এখন সংসারের মালিক। তিনি তাদের আদরও করলেন না, অনাদরও করলেন না। ক'দিন বাদে বোম্বাই ফেরার সময় আসতেই চিনু ধরে বসল যে তাকে নিয়ে যেতেই হবে। সত্যি তো, কথাটা ভাবাই হয়নি। কাকার সংসারে একা একা

চিনু কি করবে ? আশ্বস্ত হতে না পেরে চিনুকে নিয়েই এল মল্লিকা। সেই থেকে চিনু বোম্বাইতেই আছে। আই-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে সে। এবার তার বিয়ে দিলেই হয়।

গল্প শেষ করে শেখর গলা নীচু করে বলল, "তুই তো এখনো বিয়ে করিসনি—দেখ না চিনু তোর মন স্পর্শ করে কিনা।"

হেসে বললাম, "দোহাই শেখর, ওদের কানে একথা তুলে আর আমার আসা বন্ধ করিসনি। অনেক কষ্টে বিদেশ বোম্বাইতে একটি বাল্যবন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি—সেই বন্ধুকে ভায়রাভাই করার ইচ্ছে আমার এখনো হয়নি।

শেখর হেসে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা—আর বলব না।

শেখর কথা রেখেছিল। এরপর আর একদিনও সে ওকথা বলেনি।

কিন্তু যেভাবেই মানুষ বীজ ফেলুক না কেন—মাটিতে প্রাণশক্তি থাকলে ফল ফলবেই। শেখরের সেই কথার বীজও আমার মনের মধ্যে ক্রমেই অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে চারা হয়ে উঠতে লাগল। তাই অনেক দূর—যোগেশ্বরী থেকেও প্রায় প্রতি সন্ধ্যেবেলাই দাদারে যেতাম। একটি প্রগল্‌ভা, সুচতুরা, তীক্ষ্ণভাষিণীর মনের সন্ধান করতে। কিন্তু সন্ধান পেতাম না। চিনু কথা বলত, হাসিঠাট্টা করত, কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার কোন লক্ষণই দেখতাম না তার মধ্যে। মনে মনে ভাবলাম যে, হৃদয়-দুর্গ জয় করা তো সহজ কথা নয়। পাথরের তৈরি দুর্গ হয়ত ভেঙ্গে চুরমার করে জয় করা যায়, কিন্তু রক্তমাংস আর মন দিয়ে তৈরি মানুষের যে হৃদয়-দুর্গ তাকে তো আঘাত করে জয় করা যায় না। তাই মনকে বললাম, রহু ধৈর্যং।

চিনুর মন বুঝি আর নাই বুঝি যাওয়া বন্ধ করলাম না। তাছাড়া

চিনু ছাড়াও তো আকর্ষণ কম ছিল না। শেখরের বন্ধুত্ব আর মল্লিকার স্নেহ ছিল। ওদের ওখানে গেলেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠত।

এমনিভাবে দিন কাটতে লাগল। বোম্বাইয়ের আরব-সাগর, মালাবার হিল, জুহু বীচ আর এলিফেন্টা কেভস্ পুরনো হয়ে এল। বোম্বাইয়ের প্রচণ্ড রোদ আর প্রচণ্ডতর বর্ষাও মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। শেখরের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হল। আর এরি মধ্যে আমি একদিন অনুভব করলাম যে, চিন্ময়ী নামের মেয়েটি আমার মনকে কুহকজালে আচ্ছন্ন করেছে। যখন মনস্থির করলাম যে এবার শেখরকে বলব, তখন একদিন তার বাড়ি গিয়ে রূঢ় আঘাত পেলাম। তার আগের দিন আমি যাইনি আর সেদিনই চিনু কলকাতা চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ গেল যে? কবে ফিরবে?"

শেখর জবাব দিল না।

মল্লিকা দ্রুতকণ্ঠে বলল, "ফিরবে। অনেকদিন এখানে ছিল, কাকাও এবার যেতে লিখেছেন। বুঝলেন না, বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে—চেষ্টা না করলে চলবে কি করে?"

"পাত্রের খবর কিছু পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।"

চুপ করে রইলাম। ঠোঁটের কাছে এসেও কথা ফিরে গেল। প্রথম যৌবনের সেই অপ্রগল্‌ভ অবস্থাটা তো আর নেই, আত্মমর্যাদার নামে নিজেকে এমনভাবে বর্মাবৃত করে ফেলেছি যে প্রাণ যায় যাক তবু নিজেকে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করব না। সুতরাং চিনু সম্পর্কে আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। ভাবলাম পরে বলব। ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা আমার চরিত্রের বিশেষত্ব বলে আমি প্রায়ই গর্ববোধ করি। সেই গর্বে নির্বাক হয়েই রইলাম।

কিন্তু চিনু যাবার পর থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম। মল্লিকার মধ্যে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব। স্বামীর দিকে মাঝে মাঝে সে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যেন সে চোখ ফেরালেই শেখর হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। বসত সে স্বামীর কাছাকাছি, যেন আর কাউকে সে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। যদি চা চাইতাম, জল চাইতাম, পেতাম সবই কিন্তু চাকর এনে দিত। মল্লিকা স্বামীকে ছেড়ে এক পাও নড়ত না। আমার চোখে যে নির্বাক প্রশ্ন ফুটে উঠত তা বোধ হয় টের পেত শেখর কিন্তু সে বিচলিত হত না। পরিবর্তে যখনি সে স্ত্রীর দিকে তাকাত তখন অপরিসীম ভালবাসার এক গাঢ় কোমল ছায়া ঘনাত তার চোখে।

ব্যাপারটা ভাল বুঝলাম না। গর্ভাবস্থায় কি সব নারীই স্বামীকে এমনিভাবে ভালবাসে? কিংবা মল্লিকার ভালবাসার ধরনই হয়ত ওই—নইলে সে দেশ ও পরিবার ছেড়ে রাতারাতি কোন্ সাহসে শেখরের সঙ্গে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল?

মাঝে মাঝে চিনুর বিষয়ে কথাচ্ছলে হাল্‌কাভাবে প্রশ্ন করেছি এরপর। কি হল তার? বিয়ের পাকা কথা কি হয়ে গেছে? বল তো পাত্র দেখি? এসব প্রশ্নের উত্তরে শেখর সন্তর্পণে হেসেছে কিন্তু দ্রুতকণ্ঠে জবাব দিয়েছে মল্লিকা। যেন সে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি চিনুর কথা থেকে সরে যেতে চায়। সে সব জবাবও বড় ভাসা-ভাসা—শুনে শুধু অজস্র প্রশ্নই আরো জড় হয়েছে মনে।

শেখরের বাড়িতে যাওয়া কমে এল। আবিষ্কার করলাম যে শেখরের বন্ধুত্ব ও মল্লিকার প্রীতি আর মুখ্য আকর্ষণ নয়। যেদিন যেতাম সেদিনও যেন তাদের জন্যই যেতাম না—চিনুর আসার খবরটি শোনার একটা দুরন্ত প্রত্যাশা নিয়েই যেন যেতাম।

শেষে সে যাওয়াও কমে এল। প্যারেলের এক শৌখীন নাট্য-

সম্প্রদায়ে ঢুকে সাজাহান নাটকের দিলদারের ভূমিকায় মহড়া দিতে লাগলাম। প্রায় দু'মাস আর গেলাম না। শেখর ব্যস্ত মানুষ, বাড়িতে বসেও সে কাজ করে—সুতরাং সেও খোঁজ নিতে এল না। ভাবলাম সেই ভাল। চিনুর ছায়াটাও মন থেকে মুছে যাক। ওসব অনেক ঝামেলা। যেদিন দেহের পশুটা নিতান্তই শেকল ছিঁড়তে চাইবে সেদিন না হয় তার জন্য মাংসের বাজারে যাওয়া যাবে।

কিন্তু শেখর এল। আগস্ট মাসের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়। তার চেহারা দেখে ভয় পেলাম। শুকিয়ে গেছে। মাথার রুক্ষ চুলে বৃষ্টির জল। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বন্য, উদ্‌ভ্রান্ত।

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে সে বলল, চা খাওয়াবি বিনু?"

চাকরকে চায়ের হুকুম দিয়ে আমি বললাম, "তোর কি হয়েছে রে?"

শেখরের চোখ জলে ভরে এল, সে বলল, "মল্লিকা চলে গেছে বিনু।"

"কোথায়? কি হয়েছে? ঝগড়া করেছিস?"

শেখর দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, "সন্তান প্রসব হতে গিয়ে স্বর্গে গেছে—"

কোন সান্ত্বনার কথাই খুঁজে পেলাম না। কান্না চাপবার প্রয়াসে শেখরের শরীর কাঁপতে লাগল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। দূরবর্তী ইরাণী-রেস্তোরাঁ থেকে রেডিয়োর গান যেন বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে শোক-সঙ্গীত হয়ে উঠল।

কিছুই বলতে পারলাম না। এই দুমাস আমার না যাওয়ার অপরাধের পরিমাণ স্মরণ করে আমি বোবা হয়ে গেলাম। এ কি অন্যায় করেছি! একটা বাচাল মেয়ের স্মৃতিকে এড়াবার জন্য আমার বন্ধুকে আমি এতদিন ধরে অগ্রাহ্য করলাম।

খানিকবাদে নিজেকে সামলে নিয়ে শেখর সব কথা জানাল। মল্লিকা মারা গেছে প্রায় একমাস হল। বাচ্চাটা বেঁচে আছে। মল্লিকার শেষ দান। একটি ছেলে। দেখতে মায়ের মতই হয়েছে। কয়েকদিন একটি নার্স দেখছিল বাচ্চাকে। তারপর খবর পেয়েই চিনু ফিরে এসেছে।

ধ্বক্ করে উঠল বুকটা। চিনু! শেখরের সেই শোকার্ত চেহারার সামনে বসেও আমার মন খুশী হতে লজ্জাবোধ করল না।

বললাম, "আমারি দোষ—এতদিন যাইনি কিন্তু তুই একটা খবর দিলি না কেন?"

শেখর বলল, "খবর দেবার জন্য কোন তাড়া তো ছিল না বিনু। শোকের অংশ নেবার কথা বলছিস? সে তোরা কেউই নিতে পারবি না।"

চুপ করে রইলাম। একথার প্রতিবাদ করব কোন্ সাহসে?

শেখর বলল, "আজ কেন এসেছি জানিস? একটা সমস্যা হয়েছে—"

"কি?"

"মল্লিকা রোজ আসে।"

চমকে উঠলাম, "তার মানে?"

"তিন চারদিন ধরে ঘটছে ব্যাপারটা। চিনুর ওপর ভর নামে। অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপর জ্ঞান ফিরে আসতেই অন্য মানুষ হয়ে যায়। ঠিক যেন মল্লিকা।"

"অসম্ভব।" একটা রূঢ় ভঙ্গীতেই বলে ফেললাম।

শেখর মাথা নাড়ল, "অসম্ভব হলেই হয়ত ভাল ছিল।"

"দিনে ক'বার হয় এমন?"

"আজ দুবার হয়েছে—এতদিন একবার—"

"ভর নামলে চিনু কি বলে ?"

শেখর বলল, "চিনু তো বলে না—তখন যেন মল্লিকা কথা বলে। বলে যে ছেলেটার জন্য আসছি—ছেলে আর স্বামীকে এক সঙ্গে নিয়ে ঘর করতে কেমন লাগে তার স্বাদ তো পাইনি। তাছাড়া তুমি আমার জন্য ভেবে ভেবে দেহপাত করবে তা আমি সইব না—তোমায় সময়মত খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, শরীরের যত্ন করতে হবে—আমি তোমারই, আমি তোমার কাছে কাছেই থাকব—"

আমার চাউনি দেখে শেখর বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ, কালকের দিনটা ছুটি নিয়ে আমার ওখানে আয় ?"

রাজী হলাম। শেখর চলে যাবার পর সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। মল্লিকার আত্মার ওপর রীতিমত রাগ হতে লাগল। তার ভালবাসাকে বিশ্বাস করি কিন্তু চিনুকে কষ্ট দেওয়া কেন ? মল্লিকার মৃত্যু, চিনুর প্রত্যাবর্তন, তার ওপর ভর নামা—সমস্ত ঘটনাগুলোই এত আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল যে সারারাত আমি শুধু ছটফট করেই কাটালাম। ঘুম আর এল না।

পরদিন শেখরের বাড়ি গেলাম।

আজো দরজা খুলল চিনু। বেশ রোগা হয়ে গেছে। আমায় দেখে ম্লান হাসল।

"কেমন আছো চিনু ?"

প্রশ্নটা করেই লজ্জা পেলাম। একি অর্থহীন প্রশ্ন করলাম ?

কিন্তু চিনু আমার লজ্জা বাড়াল না, বলল, "আসুন।"

সঙ্গে যেতে যেতে বললাম, "তোমার ওপর আমার রাগ জমা আছে চিনু—"

"কেন ?"

"যাবার আগে একবার জানতেও পারলাম না ?'

"তাতে কি হয়েছে—এই ত' দেখা হল—আপনি ও ঘরে যান, আমি চা নিয়ে আসছি।"

শেখরের ঘরে গিয়ে বসলাম। সকাল কাটল, দুপুর হল। খাওয়া দাওয়া ওখানেই সারলাম। কিন্তু কই? চিনুকে তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। শেখর বলল রাত পর্যন্ত থাকতে। রাজী হলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল পার হতেই চারদিক অন্ধকার করে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি এল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মেঘের ডাক আর হাওয়ার ধাক্কায় জানালা দরজা কাঁপতে শুরু করল। চিনু চা আর তেলে ভাজা এনে দিল। শেখরের সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। ওঘর থেকে নবজাত শিশুটির কান্না শোনা যেতেই চিনু চলে গেল। একটু বাদেই বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে সে আবার ফিরে এল। এতক্ষণে তার মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম। যেন সে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। শেখরের চোখেমুখে ক্লান্তি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তার মনের অবস্থাটা টের পেয়ে আমি নানারকমের হাসির কথা বলতে শুরু করলাম। শেখরের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল, একটু হাসল সে। আমার একটা হাসির কথা শুনে চিনুও হেসে ফেললে।

আমি চিনুর দিকে তাকালাম। হাসলে যেন তার রূপ বেড়ে যায়। কিন্তু আমার চোখে যে মুগ্ধতা ঘনাল তা মুহূর্তে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল। চিনুর মুখের হাসি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে আলো নিভিয়ে দিলে অন্ধকারের যেমন ঝাপটা লাগে—চিনুর মুখের হাসির রেখা তেমনি এক মুহূর্তে বেদনার বাঁকা রেখায় বদলে গেল। অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ করে সে মুহূর্তকাল আমাদের দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল, তারপর সোফার মধ্যে ঢলে পড়ল।

বাইরে কোথাও দূরে বাজ পড়ল।

শেখর লাফিয়ে চিনুর কাছে গিয়ে বলল, "সে এসেছে।"

আমিও কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, লক্ষ্য করলাম যে দাঁতে দাঁত লেগেছে। চিনুর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। একটু জল নিয়ে এসে তার চোখে মুখে ছিটে দিতেই চিনু চোখ মেলল। আবার মুহূর্তকাল সেই আগেকার মত ফ্যালফ্যাল চাউনি। তারপরেই চোখের তারায় চেতনা এল, আর উঠে বসল চিনু, শাড়ীর আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিল। যেমন মল্লিকা দিত।

বাইরে হাওয়ার গোঙানি। যেন হাজার হাজার প্রেতিনী কাঁদছে।

শেখর অস্ফুটস্বরে বলল "মল্লিকা!"

চিনু শেখরের দিকে তাকাল, তার ঠোঁট নড়ল, "অনেকক্ষণ ধরে এসেছি গো—বিনু ঠাকুরপোর জন্যই ঘরে ঢুকতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।" আমার দিকে ঠিক মল্লিকার মতই মুখ ফেরাল চিনু, একটু ক্লিষ্ট হেসে বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, না বিনুবাবু?"

আমি কিছু বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন অবিশ্বাস্য অথচ অলৌকিক মনে হচ্ছিল যে কথা বলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

চিনু বলল, "ভয় নেই বিনুবাবু, কচি বাচ্চাটাকে রেখে গেছি কিনা তাই টান এড়াতে পারি না। তাছাড়া ওঁকে তো আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না—ওঁর কষ্ট দেখেই আমি ফিরে আসছি—সব গুছিয়ে দিয়ে তারপর আমি চলে যাব।"

এতক্ষণে আমি কথা খুঁজে পেলাম, বললাম, "কিন্তু এভাবে আপনি এলে চিনুর কষ্ট হবে না?"

চিনু অর্থাৎ মল্লিকা বলল, "চিনু আমার বোন, তাকে আমি কষ্ট দেব কেন? আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি বাচ্চাটার কাছে যাই।"

অবিকল মল্লিকার মত ভঙ্গীতে চিনু পাশের কামরায় চলে গেল। দেখে অবাক হলাম। এতক্ষণ ধরে চিনু যে কথা বলছিল তা সত্যি মল্লিকার মত। তার বাচনভঙ্গী, গলার সুর, হাসবার তাকাবার ভঙ্গী —সব কিছুই মল্লিকার মত।

চিনু যেতেই শেখরও তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল। সম্মোহিতের মত।

"শেখর—"

ডাকতেই থামল শেখর কিন্তু সেই কামরার দিকে তাকিয়েই বলল, "মল্লিকা—"

আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "বোস শেখর—কথা আছে।"

শেখরের চমক ভাঙ্গল, সে বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ থাকে এ ভাব ?"

শেখর মাথা নীচু করে জবাব দিল, "আধঘণ্টা একঘণ্টা—কোন ঠিক নেই।"

"তারপর আবার চিনু অজ্ঞান হয়ে যায় ?"

"হ্যাঁ—জ্ঞান ফিরে পাবার পর তার কিছুই মনে থাকে না—শুধু ঘুমোয় খানিকক্ষণ। আমিও ওকে কিছু বলিনি—চাকরদেরও নিষেধ করে দিয়েছি—"

আমি বললাম, "ডাক্তার দেখানো উচিত—"

শেখর অবাক হয়ে তাকাল, "তাহলে এটা ব্যাধি ?"

বললাম, "হতেও তো পারে—চিনু দিদিকে ভালবাসত তাই হয়ত এমন হচ্ছে—"

শেখর বলল, "কিন্তু অবিকল ওর মত—"

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, "তাহলে চিকিৎসা করাবি না ?"

শেখর অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না না—তা বলছি না। বেশ তো বিনু—তুই তাহলে ঠিক করে দে কার কাছে নিয়ে যাব"—

"সে আমি ব্যবস্থা করছি।"

খোঁজ নিয়ে দু'দিন বাদেই আমি ভাল ডাক্তার নিয়ে এলাম।

চিনু অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে আমার ?"

আমি বললাম, "তোমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, তাই শেখর বলেছিল ডাক্তার আনতে—"

চিনু রাগ করল, "কি অন্যায় জামাইবাবু—আমি তো ভালই আছি।"

ডাক্তার আড়ালে বলে গেল, "সবই তো নরম্যাল দেখছি মশাই—"

শেখর বলল, "ব্যাপারটা ঠিক অসুখ নয় বোধ হয়—"

"আমি বললায, অসম্ভব—ওকে কোন স্পেশালিস্ট দেখাও—"

"কিন্তু রোগিণী যে বেঁকে বসেছে বিনু—"

ভেতর থেকে চাকর দৌড়ে এল। চিনু মূর্ছা গেছে।

ছুটে গেলাম দুজনে। শোবার ঘরে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে মূর্ছা গেছে চিনু। সেই একই লক্ষণ। জলের ঝাপ্‌টা দিতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। সেই কয়েক মুহূর্তের বিহ্বল চাউনি। তারপর ধীরে ধীরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে উঠে বসল চিনু।

শেখর বলল, "তুমি !"

চিনু মৃদুকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ—আমি মল্লিকা।"

শেখরের চোখে এক অদ্ভুত আশ্বাস লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলাম।

চিনু ছেলের দিকে তাকাল, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জগৎ সংসারটা নানা রহস্যে ভরা বিনু ঠাকুরপো—ডাক্তার আসলেই কি সব বোঝা যায় ?"

হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভালবাসার নাম করে এই প্রেতিনী কেন চিনুকে কষ্ট দিচ্ছে!

বললাম, "আপনার কথা মেনে নিচ্ছি কিন্তু দোহাই আপনার, চিনুকে আর কষ্ট দেবেন না—আপনি ভালবাসার নাম করে এদের ওপর অত্যাচার করছেন।"

শেখর চমকে উঠে বলল, "বিনু!"

চিনু হাসল। ঠিক মল্লিকার মত। তারপর আমার ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে বলল, "চিনু আমার বোন, কিন্তু আপনার কেউ নয় বিনুবাবু।"

বলতে পারতাম যে চিনুকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু একটা অশরীরিণীকে সেই কৈফিয়ত দেওয়াটা যেন কেমন অতি-নাটকীয় মনে হল। তাই বললাম, "আমি আপনাদের বন্ধু—"

চিনু ঠিক আগের মতই হাসল, বলল,"বন্ধু বলেই আপনি অনধিকার চর্চা করবেন কেন?"

"শেখর"—আমি শেখরের দিকে তাকালাম।

শেখর চিনুর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল। বুঝলাম যে তার অশরীরিণী স্ত্রীর সান্নিধ্যে সে উত্তেজিত।

আবার ডাকলাম, "শেখর!"

শেখর তাকাল আমার দিকে।

চিনু ডাকল, "শোন—"

শেখর তাকাল তার দিকে।

চিনু অবিকল মল্লিকার ভঙ্গিতে বলল, "বিনু ঠাকুরপো এসব অবিশ্বাস করেন, না—? ওর কিছুদিন না আসাই ভাল।"

আমি বললাম, "শেখর, এতে বিপদ হবে।"

চিনু বলল, "আমি আর ক'দিন গো ?—আমি তো আর কিছুদিন বাদেই চলে যাব—চলে যাব সেই মহাশূন্যের দেশে—এই ক'টা দিন তুমি বন্ধু ছাড়া হয়ে থাকতে পারবে না ? বল—বল—"

আমি ডাকলাম, "শেখর—"

চিনু সুর চড়িয়ে বলল, "ওগো বল—"।

শেখর অভিভূতের মত তাকাল আমার দিকে, বলল, "ভাই বিনু, মল্লিকার সম্মান করা উচিত তোর।"

"তাহলে আর আসব না ?"

"মল্লিকাকে আমি ভালবাসি বিনু।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি। প্রেতিনীর জয় হোক। পত্নী-শোকাতুর ঐ উন্মাদের যা ইচ্ছে করুক। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হল যেন মৃত্যুলোক উত্তীর্ণ হয়ে জীবলোকে ফিরে এলাম। বুকভরে বাতাস নিয়ে মনে মনে বললাম, চিনু আমার কেউ নয়, ওই অসুস্থ পরিবেশে আর কোনদিন যাব না।

আর যাইনি। এক বছরের ওপর কেটে গেল। পূজো এল, গেল। রং মেখে অর্জুন সেজে গদাই সেজে হিম-সিক্ত রাতের আকাশ কাঁপালাম দু'দিন। তারপর বিজয়া-দশমী এল। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেখরের ওপর রাগ করেই থাকব ? তাছাড়া চিনুর কি হল ?

গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে। যেমন প্রথম দিনটি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম শেখরের বদলে অন্য ভাড়াটে রয়েছে সেখানে। মারাঠি পরিবার। তারা বলল যে প্রায় ছ' মাস ধরে তারা সেই ফ্ল্যাটে এসেছে।

কোথায় গেল শেখর ?

পরদিন বিকেলে তার অফিসে খোঁজ নিলাম। শেখর এখনো কাজ

করছে, তবে দু'দিন ধরে শরীর খারাপ বলে আসেনি। আর নতুন বাসার ঠিকানাটি চেয়ে নিলাম।

সন্ধ্যের মুখে বান্দ্রাতে গিয়ে শেখরের নতুন ফ্ল্যাট খুঁজে বের করলাম।

আজো দরজা খুলল চিনু। কিন্তু এ কোন্ চিনু? তার চোখ মুখে আগে যে বুদ্ধি ও প্রাণপ্রাচুর্যের একটি ঔজ্জ্বল্য ছিল তা যেন অন্তর্ধান করেছে। কেমন যেন স্তিমিত ও অবসন্ন একটা ভাব। শুধু তার চোখের তারায় এখনো সেই আগেকার রহস্য দীপ্তিটা অম্লান আছে। হঠাৎ তার দিকে ভালো করে তাকিয়েই মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত বেরিয়ে এল, "চিনু।"

চিনুর সিঁথিতে সিঁদুর। যেন আমারি রক্ত।

"আসুন বিনুবাবু—"

"কিন্তু একি চিনু?"—নিজেকে সামলে বললাম, "একটা খবরও পেলাম না!"

"খবর দেবার মত ঘটনা ঘটেনি বিনুবাবু —আসুন—"

দরজা বন্ধ করে ভেতরের একটা ঘর দেখিয়ে বিনু বলল, "ওই ঘরে যান—"

চিনু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে শেখরের গলা ভেসে এল, "বিনু নাকি? আয়—"

ভেতরে ঢুকলাম। শেখর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে একটা বই পড়ছিল, উঠে দাঁড়াল আমাকে দেখে। রোগা দেখাচ্ছে তাকে। তার ভাসা-ভাসা সুন্দর চোখ দুটোর নীচে ক্লান্তির গাঢ় ছায়া। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা।

"বোস"—কোলাকুলি সেরে, শেখর শুকনো হাসি হাসল।

আমি নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। শেখর বাসা বদলালো কেন? চিনুর কবে বিয়ে হল? কোথায় হল? আমাকে খবর দিল না কেন?

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে। শেখরের বাচ্চা নিয়ে একটি ঝি বাইরে চলে গেল।

জবাব না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "কিরে শেখর—চিনুর বিয়ে কবে হল?"

শেখর বইটা রেখে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "মাস দু'য়েক আগে—"

"বর কি করে? কোথায় থাকে?"

শেখর ম্লান হেসে বলল, "আমিই বিয়ে করেছি চিনুকে।"

জড় হয়ে গেলাম। দূর থেকে একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল।

শেখর ওপরের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, "একদিন মাঝরাতে ওর ওপর ভর নামল—মল্লিকা হয়ে ও এল আমার কাছে—তাই ওর সম্মান বাঁচাবার জন্য বাসা বদলে এখানে এনে বিয়ে করেছি—"

সমস্ত শরীরটা ঘৃণা আর রাগে রিরি করে উঠল।

চিনু চা নিয়ে এল সেই সময়ে। সঙ্গে জলখাবার। নির্বিকার তার মুখ।

সে বলল, "চা খান।"

"বললাম। না। চা ছেড়ে দিয়েছি।"

"খাবার খান তাহলে।"

"না। খেয়ে এসেছি।"

চিনু তাহার সেই রহস্যময় চাউনি মেলে আমার দিকে তাকাল। কি নির্লজ্জা! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চা জলখাবার তুলে নিয়ে চিনু বেরিয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "বৌদি এখনও আসেন ?"

শেখর জানালার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "আসে, তবে কম। তিন চারদিনে একবার। আজকাল নাকি আসতে কষ্ট হয়।"

"আর খবর কি ?"

"ভালোই।"

"তোর বাবা ওঁরা জানেন এই বিয়ের কথা ?"

"জানাইনি। তাছাড়া বাবাকে জানাবার সময়ও হয়নি। এই বিয়ের পরই বাবা হঠাৎ মারা যান।"

"তাহলে ভালোই আছিস ?" কথাগুলোর মধ্যে একটু শ্লেষ না জড়িয়ে পারলাম না।

শেখর এবার আমার দিকে তাকাল, যেন অনেক দূর দেখছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ—ভালোই আছি।"

"অফিসে শুনলাম তোর জ্বর ?"

"ও কিছু না—আর একদিন জিরোলেই ঠিক হয়ে যাব।"

"বেশ। তাহলে আজ উঠি।"

"খেয়ে যাবি না ?"

"না।"

পেছন দিকে আর একবারও তাকালাম না, যেন নরককুণ্ড থেকে পালিয়ে গেলাম।

রাস্তায় পা দিতেই দেখি একটা ট্যাক্সি। উঠে বসলাম, বললাম, "চালাও"—

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ?"

"সোজা চলতে থাকো—জোরে—ভেবে বলছি—"

তারপর মুছে ফেলে দিলাম ওদের মন থেকে। অন্তত ভাবলাম যে মুছে ফেলেছি।

ক'দিন কেটে গেল মনে নেই। হয়ত পনরো দিন। হয়ত কুড়ি দিন।

সেদিন সন্ধ্যায় ভূত-দেখার মত চমকে উঠলাম।

দরজার গোড়ায় চিনু।

"বিনুবাবু—বড় বিপদ—"

হঠাৎ নির্মম হয়ে উঠলাম, ভদ্রতার মুখোশটা খুলে শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বললাম, "কিন্তু তুমি কে কথা বলছ? মল্লিকা বৌদি না চিনু?"

চিনু স্থিরদৃষ্টি মেলে বলল, "আপনার বন্ধুর দ্বিতীয়া স্ত্রী।"

কিছু ছিল তার বলার ভঙ্গিতে—থমকে গেলাম।

চিনু বলল, "আপনার বন্ধুর খুব অসুখ—নিউমোনিয়া—দুটো লাংসই ভর্তি। চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না—"

মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম। ধমকে বললাম, "খবর দাওনি কেন?"

"উনি নিষেধ করেছিলেন—আপনার ঘৃণা সেদিন উনি টের পেয়েছিলেন।"

আর কোন কথা না বলে চিনুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

আমাকে দেখে শেখরের চোখ ছলছল করে উঠল, ক্ষীণকণ্ঠে বলল "বোস্"—

বসলাম।

সে রাত কাটল। পরদিন অবস্থা আরো খারাপ হল। ডাক্তার এল, গেল। নতুন নতুন ডাক্তার ডাকলাম। কিছুই হল না। পরদিন অবস্থা আরো গুরুতর হল। দিন গেল। কোন আশাই খুঁজে পেলাম না। সন্ধ্যে হল। রাত এল। বাইরে শীতের রাত কুয়াশার মোড়কে গভীর হয়ে উঠল। শেখর আর কথা বলছে না।

হঠাৎ চিনু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মল্লিকা হয়ে জেগে উঠে সে

শেখরের কাছে গিয়ে বসল, তার দুহাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওগো—তোমাকে বাঁচতে হবে"—

শেখর ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল, হাসল, অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "মল্লি—আসছি—"

"ওগো না না—আমি চিনুর মধ্যে থাকব—তুমি বাঁচো—"

শেখর ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

আমি চিনুর হাত ধরে টেনে দরজার গোড়ায় নিয়ে গেলাম, হিংস্র-কণ্ঠে বললাম, "স্বামীকে নিয়ে যাবার জন্য এত নাটক কেন বৌদি? —যান—আপনি ওদিকে—"

ঠিক মল্লিকার মত চিনু আমার দিকে একবার তাকাল তারপরে অন্য ঘরে চলে গেল।

রাত আরো বাড়ল। চাকর আর আমি জাগছিলাম। খানিক বাদে ঝিমুনি এল।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ মেলে দেখি শেখর কিছু বলতে চাইছে।

"কি? কি—শেখর?"

কি যেন বলতে চাইল শেখর, কি যেন খুঁজল ঘরের ভেতর, তারপর চোখ বুজল।

"চিনু"—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

চিনু ছুটে এল। তখন সে চিনুই। মল্লিকা তার স্বামীকে তখন নিয়ে গেছে।

দুদিন যেন ঘোরের মধ্যে কাটল। অফিস থেকে আরো ছুটি নিলাম। চিনুকে সাহায্য করতে হল। সব চুকে গেল শেষে।

দুদিন বাদে জিজ্ঞেস করলাম, "শেখরের ভাইদের খবর দেওয়া দরকার—"

চিনু বলল, "দিয়েছি।"

"তারা কবে আসবেন?"

"আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।"

"কেন?"

"কি হবে এসে?"

"তার মানে—তুমি একা থাকবে নাকি?"

"হ্যাঁ। হিন্দুর সংসারে মেয়েদের তো কোন মান সম্মান নেই বিনুবাবু। উনি যা রেখে গেছেন তাতে চলে যাবে আমাদের। আমিও কোন কাজ যোগাড় করে নেব। তাছাড়া পৃথিবীতে সবাই তো আসলে একা—"

তার দার্শনিক উক্তিতে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। রাগ হল। বললাম, "বেশ, যা ভাল বোঝ তাই কর।"

চিনু বলল, "আপনি বড় কষ্ট পেলেন আমাদের জন্য।"

আমি বললাম, "ধন্যবাদ—এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্যই তো কষ্টটা পেলাম।"

চিনুর মুখ কালো হয়ে গেল।

তারপর থেকে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিতে যেতে লাগলাম। নেহাতই শেখরের কথা ভেবে। অমন একটা সুন্দর প্রাণ শেষ হয়ে গেল! আশ্চর্য।

কিন্তু চিনু নির্বিকার। সে আমার কোন সাহায্যই চায় না, বেশী কথাও বলে না, অথচ এও বুঝি যে সে আমায় দেখে বিরক্তও হয় না। যাই, একটু বসি, তার বৈধব্যের শ্বেতশুভ্র সাজের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চলে আসি। যেতে যেতে আবার যেন

যাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেল। যেতে যেতে আবার যেন নেশা চাপল। তার শুভ্র বসনের ওপর আমি মনে মনে বাসনার আবীর ছড়াতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে দেখি সে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। আমায় দেখে হেসে বলল, "খোকন বড় দুষ্টু হয়েছে।"

বাচ্চাকে শুইয়ে সে কাছে এসে বসল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা চিনু, বৌদি কি এখনো আসেন?"

চিনু চম্‌কে তাকাল, তারপর বলল, "না। দিদি আর আসেন না।"

"তাহলে শেখরের সঙ্গে উনিও গেছেন?"

চিনু তার গভীর কালো চোখের রহস্যময় দৃষ্টিটা মেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "আপনার বড় কৌতূহল বিনুবাবু"—

"হ্যাঁ চিনু—তোমার বিষয়ে আমার খুব কৌতূহল"—

চিনু নির্ভয়ে বলল, "তাহলে শুনুন। দিদি কোনদিনই মরার পর আসেওনি, যায়ওনি—ওঁর যাওয়ার সঙ্গেই আমার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—"

ঘরটা যেন দুলে উঠল।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। বহুদিন ধরে যে সন্দেহ মনের ভেতর কুড়ে খাচ্ছিল তা আজ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও যেন বিমূঢ়তা কাটল না।

চিনু বলতে লাগল, "বলি আপনাকে। কাউকে না বলে আমিও যেন শান্তি পাচ্ছি না। হয়ত ঘৃণা করবেন, তা করুন। এ জগতে একথা শোনবার মত আপনি ছাড়া তো আর কেউ এখন নেই। আমায় নির্লজ্জা ভাববেন না, যে মেয়ে এত বড় অভিনয় করতে পারে সে সব কথা বলার সাহসও রাখে।"

মুখ ফিরিয়ে বললাম, "বল চিনু।"

চিনু বলতে লাগল, "ভালবেসেছিলাম। ও যখন দিদিকে পড়াত, তখন থেকে। কিন্তু ও তো আমায় ভালবাসেনি। ও ভালবেসেছিল দিদিকে। মনপ্রাণ দিয়ে। সেই ভালবাসার সামনে আমার ভালবাসা বড় হীন মনে হত, বড় ছোট মনে হত আমার দাবী। তাই নিজেকে চোখ রাঙিয়ে, আত্মনিগ্রহ করে, ওদের সাহায্য করেছি। যখন ওদের ভালবাসার বিরুদ্ধে জগৎসংসার এক হয়ে দাঁড়াল তখন আমি ওকে ভালবাসি বলেই দিদিকে পালাতে সাহায্য করলাম। দিদির বিয়ে হল। দিদি সংসার পাতল। বাবা যদি অকালে না মরতেন তাহলে হয়ত আমার এই অস্বাভাবিক ভালবাসা কোনো এক মধ্যবিত্ত সংসারের চার দেয়ালে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না। বাবা মারা গেলেন। কাকার সংসারে একা হয়ে পড়ায় দিদির কাছে যাওয়ার কোন বাধাই রইল না।

দিদির সংসারে, দিদির সুখ দেখে সুখী হলাম। কিন্তু একটু জ্বালা কি হয় নি? হয়েছিল। আজ সত্য স্বীকার না করলে তো এত কথা বলার কোন অর্থই হয় না। তাই অকপটে স্বীকার করছি যে ওদের সুখ দেখে সুখী হয়েও সুখী হতে পারিনি। একটা ছোট্ট বিষাক্ত কাঁটার খোঁচায় অনবরত ছটফট করেছি। ভালবাসা মেয়েমানুষের স্বার্থানুভূতিকে প্রখর করে তোলে। তাই দিদি টের পেল শেষে। আমার বিয়ের অছিলা করে কাকাকে চিঠি লিখে আমায় রাতারাতি কলকাতায় পাঠাল। ভাবলাম ভালই হল। কারণ দিদির সঙ্গে না হয় স্বার্থের জন্য আমিও লড়তে পারি, কিন্তু যে আমাকে ভালবাসে না তার ভালবাসা আদায় করি কি করে? না, ও আমাকে ভালবাসত না। একটুও না। ও ছিল সাধু, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। তাই দূরে গেলাম। কিন্তু দূরে গিয়ে আরো মজলাম। ওদিকে বিয়ে হল না আমার। হবে কি করে? যে পাত্রই আসত আমি বলতাম পছন্দ হল না, জোর করে

বিয়ে দিলেই বিষ খাব। কাকা শেষে ক্ষেপে গেলেন। হয়ত একটা কিছু হয়ে যেত, কিন্তু তার আগেই দিদি মারা গেল। আমি তো চাইনি তা। জীবন-দেবতা আমাকে দিয়ে একটা হীন অভিনয় করাবার জন্যই যেন আবার এখানে ঠেলে নিয়ে এলেন। দিদির ছেলেকে বুকে তুলে নিলাম। কিন্তু দেখলাম যে ও দিদির ধ্যানেই মগ্ন। শিবের মত। দেখে দেখে মনের মধ্যে বিষিয়ে উঠল। ভাবলাম এসব ঢং, ভড়ং। নিজের নারীসত্তার পূর্ণ শক্তিকে পরখ করার ইচ্ছে হল। ভাবলাম কি যায় আসে? আমি তো ওকেই চাই। লজ্জাই বা কিসের? দিদি যতদিন ছিল ততদিন আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, নীতিধর্মের সব শাসনই মেনেছি। দিদি বলেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কিন্তু আর কেন? ভালবাসি বলেই ওকে প্রলুব্ধ করার অধিকার আমার আছে। তাই সাজগোজ করতে আরম্ভ করলাম। মেয়ে মানুষের তূণীরে যত তীর আছে সব ব্যবহার করলাম। কিন্তু ও শিবের চেয়েও নির্মম, নিরাসক্ত হয়েই রইল। না, ভান নয়। দিদির ধ্যানে ও এত মগ্ন থাকত যে আমার ছলাকলার বিষয়ে ও এতটুকুও সচেতন হল না। আমি যে ওর 'সই'। আমি বুঝলাম যে দিদি ওকে মৃত্যুলোকে থেকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। দিদির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ওকে আমার করার তখন একটিমাত্র পথ দেখতে পেলাম। কঠিন পথ। তাছাড়া আর উপায় ছিল না। তাই একদিন দিদির ভর নামল আমার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শিবের ধ্যান ভাঙ্গল। কিন্তু আকৃষ্ট হয়েও প্রথমটা ভয় পেল ও, তাই আপনাকে গিয়ে সব কথা বলল! আপনি এলেন, আপনার চোখে আমি সন্দেহ দেখলাম। দেখলাম যে আপনি আমার শত্রু। তাই আপনার আসার পথ বন্ধ করলাম। ও পুরোপুরি বিশ্বাস করল আমার অভিনয়। মৃত্যুলোকের মল্লিকা ওকে নতুন করে মুগ্ধ করল, ওর ভালবাসাকে তীব্রতর করে তুলল, আর আমি মরিয়া হয়ে

উঠলাম। আমি বুঝলাম যে আমার এত বড় সাধনাও ব্যর্থ, নিষ্ফল হল। আমি একদিন মল্লিকা হয়ে ওকে বললাম যে চিন্নুকে বিয়ে কর। ও কেঁদে বলল, আমাকে এসব বলে কষ্ট দিও না মল্লিকা। আমার সব চাতুর্য ব্যর্থ হল। রক্তলোভী জানোয়ারের মত তখন আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম। শেষ আঘাত করলাম। মল্লিকা সেজেই একদিন মাঝ-রাতে ওকে বিভ্রান্ত করলাম, ওকে আমার বুকে টেনে আনলাম। চিন্ময়ী হয়ে যা চেয়েছিলাম তা মল্লিকার অভিনয় করে পেলাম। কিন্তু আনন্দ হল কৈ? অসহ্য গ্লানিতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। হেরে গেলাম। তবু অভিনয় চালু রাখলাম। মিথ্যাই ভাল। দিদির সঙ্গে একাত্ম হয়েই তার ভালবাসার স্বাদ পেলাম। কিন্তু ফল সাংঘাতিক হল। যখন আমি চিনু থাকতাম তখন আর আমার দিকে ও তাকাতে পারত না। বুঝলাম যে অপরাধ আর গ্লানি ওকে পীড়া দিচ্ছে। হঠাৎ একদিন ও বাসা বদল করে এখানে এল, আমাকে বলল, চিনু তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি দুরুদুরু বুকে সম্মতি দিলাম। আর্য-মতে বিয়ে হল আমাদের। যার নামাঙ্কিত সিঁদুর পড়তে চেয়েছিলাম সেই সিঁদুরই পরলাম। কিন্তু রাতে ও এলো না আমার কাছে। আমি মল্লিকা হয়ে ওকে গিয়ে আশ্বস্ত করলাম যে ও ঠিকই করেছে। কিন্তু ও হাতজোড় করে বলল, আমায় মাপ কর মল্লি, আমায় মাপ কর। তারপর থেকে ও আমায় ছুঁত না। আমি স্ত্রী হবার পর মল্লিকার আত্মাও ওকে বিচলিত করতে পারল না। তখন মল্লিকা সাজা কমিয়ে দিলাম। ভাবলাম হয়ত ওর অপরাধ-বোধ এতে কমতে থাকবে। একদিন রাতে আমি আত্মগ্লানির বোঝা নিয়ে চিনু হয়েই ছিলাম। হঠাৎ এসে ডাকল, চিনু! আমি দু'হাত বাড়াতেই ও এগিয়ে এল। চিনুর কাছেই এল। যে রক্তের স্বাদ আমি ওকে পাইয়েছিলাম সেই স্বাদের লোভে ও মল্লিকার আকাশ থেকে চিনুর মর্ত্যলোকে নেমে

এল। আমি জিতলাম। শুধু একটি রাতের জন্য। রক্তের জোয়ার নামতেই ও পালিয়ে গেল। তারপর থেকেই ও পালিয়ে পালিয়েই বেড়াতে লাগল। মরমে মরে গেলাম। ওর কষ্ট দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ওকে সুস্থ হবার জন্য মাথা খুঁড়তাম, কাঁদতাম। মল্লিকা সেজে তিরস্কার করলে বলত—মল্লি, আমায় নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। কিছুই হল না। ও বাইরে বাইরে ঘুরতে আরম্ভ করল, অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে লাগল। একদিন অল্প জ্বর হল। তারপরের দিনই আপনি এসেছিলেন। আপনি যাবার পরই হঠাৎ বাইরে গেল, সারারাত হিমে ভিজে শেষ রাতে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর—"

রুদ্ধ হয়ে এল চিনুর গলা। সে থামল। আমি তাকালাম। না, চোখে জল নেই তার। সে কাঁদছে না। তার দু'চোখ জ্বলছে। প্রেতিনীর চোখের মত। বৈশাখের রোদে পোড়া প্রান্তরের মত। আশ্চর্য এক রূপসী বলে তাকে যেন আজ আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম। মুগ্ধ হলাম, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইলাম। আবার সেই সঙ্গে ঘৃণা হল, রাগ হল, জ্বালা হল।

চিনু বলল, "কি ভাবছেন?"

বললাম, "শোনার সাহস আছে?"

চিনু ঘাড় নেড়ে বলল, "বলুন।"

"তুমি পাপিষ্ঠা—"

চিনু তার সেই রহস্যময় চাউনি মেলে হাসল, বলল, "বিনুবাবু, আপনি ভালবাসা কাকে বলে জানেন না। ভালবাসা পাপও নয়, পুণ্যও নয়।"

উঠে দাঁড়ালাম। না, এই পাপিষ্ঠাকে আমি জয় করতে পারব না।

"চললেন?"

থেমে বললাম, "হ্যাঁ।"

তাকালাম তার দিকে। তার বৈধব্যের শুভ্রতাকে আমার নির্বোধ বাসনা আবার রঙীন করে তুলল।

হঠাৎ মরিয়া হয়ে বললাম, "চিনু—"

"বলুন—"

"একা একা সংসার চালাতে তোমার ভয় করবে না?"

"না। আমি তো স্বাভাবিক প্রাণী নই বিনুবাবু—তাছাড়া দুটি সন্তান নিয়ে আমার ভয়ের কি আছে?" আমার দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চিনু যোগ করল, "আপনার বন্ধুর দ্বিতীয় সন্তান আমার মধ্যেই।"

তাই, চিনুর মুখে চোখে একটা নতুন রংয়ের প্রলেপ!

বললাম, "চিনু—একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"আমিও স্বাভাবিক নই—আমিও ভয় করি না।"

"কাকে?"

"সমাজ, সংসার, সংস্কার—"

চিনু আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, "বুঝেছি বিনুবাবু। অনেকদিন ধরেই আপনার মনের কথা আমি জানি। কিন্তু তা হয় না।"

"কেন? কেন হয় না চিনু?"

"আমি তো আর এ জগতে বাস করি না।"

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "কিন্তু আমি প্রতীক্ষা করব চিনু—যেমন তুমি শেখরের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলে—"

চিনু মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কোন লাভ নেই বিনুবাবু—"

তার কথার মধ্যে এমন একটা সমাপ্তি ধ্বনিত হল যে আমি আর কথা খুঁজে পেলাম না।

বললাম, "তাহলে যাই ?"

চিনু মাথা নীচু করে বলল, "যাও।"

"আবার পরে আসব।"

চিনু বলল, "না—আর এসো না।"

দিনের আলোতেও বারান্দাটা হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর আর যাইনি। কিন্তু আশাও ছাড়িনি। এ জগতে সব কিছুরই যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যুও আছে। ভালবাসারও। শেখরের জন্য চিনুর সে ভালবাসা তারও কি একদিন মৃত্যু হবে না ? আমি সেই আশাতেই বাঁচব।

পঞ্চম রাগ

হঠাৎ সাদিক হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ফতেপুর নামক ছোট্ট একটা স্টেশনে আমরা আটকা পড়েছিলাম। আমি, রণবীর সিং আর স্যামুয়েল। ফতেপুর থেকে রেলের একটা শাখা লাইন পঁচিশ মাইল দূরবর্তী নিমগড় গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারই তদারক করে ফিরছিলাম আমরা। ফতেপুরে পৌঁছে শুনলাম যে, রাত আটটার গাড়ি আসতে রাত দুটো বাজবে; কারণ মাঝপথে কোন এক শিউনগরের কাছাকাছি একটা মালগাড়ি 'ডিরেলড্' হয়েছে। রাত হবে শুনে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য স্টেশনের বাইরের 'হিন্দু ভোজনালয়ে' গিয়ে নানারকম হুকুম জারি করলাম। প্ল্যাটফর্মে ফিরে লালাসিক্ত রসনা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সাদিক হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দীর্ঘ দশ বছর বাদে।

মিঞা আমাকে দেখে হেসে মীর্জা গালিবের একটা 'শের' আওড়ালেন,

"জিন্দ্‌গী ইঁউভী গুজরহী যাতি
কেঁ্যা তেরা রাহ্‌গুজর ইয়াদ আয়া।"

তার প্রসারিত হাতের প্রীতিকেআঁকড়ে ধরে বললাম, "তার মানে?"

সাদিক হোসেন বললেন, "মানে জীবন তো এভাবেও কোনমতে কেটে যেত, তবু কেন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল?"

দশ বছর বাদে দেখার বিস্ময়-ঘোর কাটতেই নজরে পড়ল যে, ছাড়াছাড়ি হবার সময় যে সাদিক হোসেনের মাথার চুলে ভ্রমরের কালো রং গাঢ় কালো হয়ে ছিল, তা এখন প্রায় সবটাই বুনো হাঁসের পালক

হতে চলেছে। তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ, এখন চল্লিশ। চল্লিশে চুলে পাক ধরে বটে, কিন্তু কৈ, আমাদের তো অমন হয়নি!

জিজ্ঞেস করতেই সাদিক হোসেন মুচকি হাসলেন, বললেন, "অনেক ঘাটের জল খেয়েছি অশোক—অনেক রং দেখে দেখেই রং বদ্‌লেছে।"

সহকর্মীদের সঙ্গে সাদিক হোসেনের আলাপ করালাম। দশ বছর আগে যে বন্ধুত্বে আতর লাগিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌ শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতাম, সেই কথা স্মরণ করে বুকের ভেতরটা বেদনায় টন টন করে উঠল। এখন সাদিক হোসেন থাকেন হায়দ্রাবাদে, আর আমি থাকি নাগপুরে। সম্প্রতি তিনি জামসেদপুর থেকে নিজের শহরে ফিরছেন। লক্ষ্ণৌএর সাদিক হোসেন গরীব ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর চোখে মুখে ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট ছাপ। প্রাচীন নবাব বংশের আভিজাত্য তাঁর রক্তে, সেই রক্তের গর্বে ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিজের কলিদার পাঞ্জাবিকে ঘামে ভেজাননি তিনি; কিন্তু হঠাৎ তারপরেই তাঁর মোহ-মুক্তি ঘটল একদিন, তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গা ঘুরে শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে পাঁচ বছর যাবৎ তিনি এখন এক মিলের মালিক।

তাঁর এই উত্থানের কাহিনী শুনে খুব খুশী হলাম। বিজয়ী, পরোপকারী ও সুরসিক সাদিক হোসেনকে নিয়ে স্টেশনের দোকানে যখন রীতিমত উৎসবের হল্লা শুরু করলাম তখন আমাদের অশুভ যাত্রার ওপর ঝড়-বৃষ্টি নেমে এল।

বনোয়ারী ঠাকুরের দোকানের পুরী খেয়ে পেট ভরিয়ে, তারপর বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে স্টেশনের ছোট্ট ওয়েটিংরুমে ফিরে দেখলাম যে, রাত দশটা।

সাদিক হোসেন স্যুটকেস খুলে আধ বোতল হুইস্কি বের করে

বললেন, "বহুদিন পরের এই মুলাকাতকে এসো একটু রঙীন করে নিয়ে নিই দোস্তরা"—

আমরা এক সুরে চেঁচিয়ে বললাম, "সাদিক হোসেন জিন্দাবাদ"—

ওয়েটিং রুমের লোকটা সোডা এনে দিল। সেই আধবোতল হুইস্কি ভাগ করে খেলাম আমরা। তরল একটু নেশা চেতনার ওপর ঝিরঝিরে হাওয়ার মত দোলা দিতে লাগল। সেই মৃদু নেশা আর এলোমেলো গল্পকে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে জটিল করতে করতে আমরা থামলাম গিয়ে প্রেমের গল্পে।

প্রশ্ন উঠল, প্রেম কি?

আমি বললাম যে, প্রেম একটা ব্যাধি।

রণবীর সিং বলল যে, প্রেমই জীবনকে সার্থক করে।

ম্যানুয়েল বলল যে, প্রেম শব্দটি একটি জৈবিক ক্ষুধার রোম্যান্টিক নাম।

নিজের নিজের উক্তিকে সপ্রমাণ করার জন্য প্রত্যেকেই এক একটি গল্প বলতে লাগলাম। সকলের মত্ত বাক্-বিতণ্ডা ও গল্পের মধ্যে একমাত্র সাদিক হোসেনই অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে একমাত্র শ্রোতা হয়ে রইলেন। ঝড়-বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, ছোট্ট এক প্রায়-অখ্যাত স্টেশনের অতি-ক্ষুদ্র ওয়েটিং-রুমে, অতি-ম্লান রহস্য-ক্ষীণ আলোর নীচে বসে কবে কোন্ সুনয়নার চঞ্চল কটাক্ষে কার ইহজীবন ছারখার হয়ে গেল, কার রক্ত-পুষ্পের মতো ঠোঁট দেখে কে লোকলজ্জাকে অগ্রাহ্য করে জন-প্রবাদের সৃষ্টি করল, কে কোন্ তন্বীদেহের লাস্য-লালসায় আত্মহত্যা করল—এমনি সব কাহিনী বলতে লাগলাম আমরা।

গল্প-শেষে আমি বললাম, "প্রেম নিছক রূপজ আকর্ষণ"—

রণবীর সিং বলল, "না—রূপটা গৌণ—উপলক্ষ্য—বড় প্রেম হয়ত কোন রূপসীর চোখের তারা দেখে কিংবা তার বাঁকা ভুরুর বিদ্যুৎ-

ঝলকে বিচলিত হয়ে, কিংবা তার দেহলতার সুঠাম ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় আত্মার আত্মীয়তাবোধের গভীর ও তীব্র অনুভূতিতে গিয়ে”—

ম্যানুয়েল বলল,“রট—প্রেম হচ্ছে রূপাগ্নির চারদিকে অন্ধ পতঙ্গের আত্মাহুতির আকৃতি—টেক্ ইট ফ্রম মী—এই শেষ কথা”—

“না সাহেব—না”—

চম্‌কে তাকালাম সবাই। সাদিক হোসেনের গাম্ভীর্য টলেছে, তাঁর দু'চোখের পিঙ্গল তারায় একটা বন্য দীপ্তি।

তিনি বললেন, “তোমরা যা যা বললে হয়ত তা সবই ঠিক, কিন্তু তবু তা শেষ কথা নয়। এও তো হতে পারে যে, প্রেম কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের মত—হৃদয়কুঞ্জে তা ধ্বনি তুললেই লোকলজ্জা বিসর্জন দিতে হয়—এও তো হতে পারে যে, প্রেম একটা সুগন্ধী ফুলের মত, ফুটলেই তার গন্ধে পাগল হতে হয়। তখন কে কি সে খেয়াল থাকে না, কুলশীলের বাছবিচার থাকে না, সুর্মা-আঁকা চোখ কিংবা বসরাই গোলাপের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দেখারও দরকার হয় না—তখন না দেখেও প্রেমে পড়ে মানুষ”—

আমি পরিহাসের সুরে তর্জনী তুলে বললাম, “সাদিক হোসেন!”

সাদিক হোসেন হাত তুলে আমায় থামিয়ে বললেন, “আমাকে পাগল ভেবো না অশোক। দু'পেগ হুইস্কিতেই আমার নেশা হয়েছে বলেও হেসো না। আমি সব কথা বহাল-তবিয়তেই বলছি এবং যা বলছি তাকে বোঝাবার জন্য একটি গল্পও শোনাচ্ছি তোমাদের। গল্পটি সত্যি। স্থান লক্ষ্ণৌ শহর, কাল ছ'সাত বছর আগে, পাত্র-পাত্রী আমার সুপরিচিত।

প্রধান চরিত্র নবাব আকবর আলি। কোথাকার নবাব তা বলে তোমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানকে পীড়িত করতে চাই না। আকবর

আলি নামে নবাব, আসলে দেউলিয়া। বহুদিন আগে যে নবাবী ইংরেজের কূটচক্রে সমাধিস্থ হয়ে ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় আশ্রয় নিয়েছে, সেই নবাবীর উপাধিটুকুই এখন সম্বল। নাম আছে, কিন্তু দাম নেই। ইতিহাসের ওপর বিস্মৃতির ধুলো যতই জমে উঠছে ততই কিন্তু সেই নবাব-বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ শহরে, ও শহরে, অমুক গ্রামের ভাঙ্গা অট্টালিকায় ভাগ্যের পরিহাসের মত কত নবাবেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত কেউ আমার মত ব্যবসাদার, কেউ সরকারী চাকুরে, কেউ গুণ্ডা আবার কেউ বা বিড়ির দোকানদার। তারা আর রাজপ্রাসাদে থাকে না, অতীতের সেই গোলাপজলে মোছা রঙমহল, আতরগন্ধে মদির শিষ্‌মহল আর প্রতিধ্বনি-ভরা দরবার-কক্ষ তো কবে ধুলো হয়ে উড়ে গেছে; কিন্তু তবু কত অখ্যাত রাস্তায় আর আলোহীন সঙ্কীর্ণ গলিতে নবাব উপাধি-ভূষিত বহু লোক এখনো সেই অতীতের স্মৃতিকে রোমন্থন করে দিন কাটায়, ধূলি-লীন সেই শ্বেত-পাথরের রাজমহলকে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায়, কোমরে হাত দিলে এখনো তারা সোনার খাপে-মোড়া প্রভুত্বের বাঁকা ছোরার স্পর্শ পায়।

এমনি এক নবাব আকবর আলি। তাঁর বাপ সাজ্জাদ আলি ছিলেন সাব-ডেপুটি। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন ছেলের বয়স চব্বিশ। বাপের সঞ্চিত টাকা আকবর আলির রক্তের মধ্যেকার প্রসুপ্ত নবাবী উচ্ছৃঙ্খলতাকে খুঁচিয়ে তুলল। দু'তিন বছরেই সব টাকা যেন পাখা মেলে উড়ে গেল। বাঈজী কনিস বেগম আর ফিরোজাবাঈএর ঘাঘরার ঘূর্ণনে ও সুর্মা-আঁকা চোখের কটাক্ষে বসতবাড়ি নীলাম হয়ে গেল—রইল শুধু পুরনো ও ছোট দোতালা বাড়িটা, ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়ে সেই বাড়িতেই গিয়ে উঠলেন আকবর আলি। অবস্থান্তরের পর যখন বেপরোয়া নবাব আবার কনিস বেগমের দরজায় করাঘাত করলেন, তখন আর কেউ সে দরজা খুলল না। ফিরোজাবাঈও তাঁরই চোখের

সামনে দিয়ে স্বল্প-পরিচিতার হাসি হেসে ব্যবসাদার ইমামবক্সের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। বাঁকা ছোরার ক্রূর দীপ্তি চোখে ঝিলিক মারতেই হতাশার সঙ্গে নবাব আকবর আলির মনে পড়ল যে, এটা ইংরেজ আমল, নবাবী আমল বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে, এখন আর ইচ্ছামাত্র বিশ্বাসঘাতিনীদের শাস্তি দেওয়া যায় না।

মনে বড় চোট লাগল আকবর আলির। এক বোতল হোয়াইট হর্স দিয়ে সেই আঘাতকে ডুবিয়ে মারতে চাইলেন তিনি, তারপর নেশা স্তিমিত হতেই মনে বৈরাগ্য এল। আর বৈরাগ্যের ফলেই একদিন বিয়ে করে ফেললেন তিনি। রাজ্যহীন, প্রাসাদহীন নবাবের বাড়িতে সম্ভ্রান্ত গরীবের মেয়ে রোশানারা বেগম এসে দেখলেন যে, প্রতি ঘরেই দারিদ্র্য আর অভাবের অন্ধকার এবং নবাব সাহেবের এই অতি-সীমায়িত রাজ্যে একমাত্র বাঁদী সাকিনা ছাড়া ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী আর কেউ নেই। বংশানুক্রমে যেসব গোলামেরা কাজ করত, তারা আর নেই ; ঐশ্বর্যের সঙ্গে একে একে তারাও অন্তর্ধান করেছিল। শুধু তাই নয়, সেই সব গোলামেরা এখন অনেকেই নবাব আকবর আলির চেয়েও অবস্থাপন্ন। সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে, এই বাড়িটার পাশেই নতুন যে বড় বাড়িটা সবার চোখের তারাকে স্থিত করে দেয়, তার মালিক খানসাহেব মোহম্মদ ইউসুফের প্রপিতামহ আকবর আলির প্রপিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব আসাহুল্লা খাঁর পেয়ারের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু উপায় কি, যুগ বদলেছে। ইতিহাসের চাকার মারফত খোদাতালাহ্ উঁচুকে নিচু, নিচুকে উঁচু করে তাঁর বিচিত্র লীলা খেলে চলেছেন—তাই আকবর আলি চুপ করে সয়েই যান, শুধু ভুলেও কখনো ইউসুফ মিঞার বাড়ির ধার-কাছ দিয়ে হাঁটেন না।

আপাতত নতুন বেগমকে নিয়ে মশগুল হলেন আকবর আলি। দিনরাত কেটে চলল। নতুনের উত্তেজনাটা কমতেই হঠাৎ একদিন

তিনি আবিষ্কার করলেন যে, রোশানারা বেগম বড় ঠাণ্ডা, বড় বেশী ভদ্র, বড় বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তাঁর রক্তের টগ্‌বগানির সঙ্গে বেগম সুর মেলাতে পারেন না, বেগমের কটাক্ষে কনিসের মত খোরাশানী ছোরার ধার নেই, তাঁর ঠোঁটের হাসির মধ্যে ফিরোজার মত ক্রূরতার প্রলেপ নেই। কোথায় কি যেন কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল। এদিকে সংসারের অভাব একদিন আতরকে নিঃশেষ করল, বিলিতী মদের প্রার্থনাকে শ্লেষভরে প্রত্যাখ্যান করল, নিশীথ রাতের উষ্ণ ঘুমকে শীতের হাওয়া এসে আক্রমণ করল। আকবর আলি সচেতন হলেন, স্থির করলেন যে এবার রোজগার করতে হবে।

নবাব আকবর আলি ইনসিওরেন্সের দালাল হলেন। কিছু কেস পেলেন, পেলেন কাঁচা টাকা। টাকা পেতেই মনের কাঁটা তুলে রক্তের মধ্যেকার আরবী ঘোড়াকে বল্‌গা খুলে কষাঘাত করতে করতে কনিসের দ্বারে গিয়ে আবার করাঘাত করলেন। হয়ত কাঁচা টাকার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই কনিস আজ দরজা খুলল। তাকে দেখেই দ্বারপ্রান্তে একমুঠো নোট ছড়িয়ে আকবর আলি শের আউড়ে বললেন,

"শোলয়ে ইশ্‌ক্‌! লগা আগ ন
দিলমেঁ মেরা,
ইয়েহ্‌ তো আল্লাহ্‌কা ঘ্যর হ্যয়,
কিসী দুশ্‌মনকা নহীঁ।"

'হে ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ, আমার বুকে কেন আগুন জ্বালাচ্ছ! আমার এই হৃদয়ে তো ভগবানই থাকেন, তোমার কোন শত্রু নয়।'

কনিস ছড়ানো নোটের ওপর এক নজর বুলিয়ে অতি মিষ্টি হেসে বলল, "আপ বড়ে জিন্দাদিল্‌ হ্যঁয় নবাব সাহব, আইয়ে আইয়ে, তশ্‌রীফ্‌ লাইয়ে"—

রোশানারা বেগম সব টের পেলেন, স্বামীকে পুরোপুরি চিনলেন।

কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি, কোনো মন্তব্যই করলেন না। আর কি-ইবা বলবেন—দরিদ্রকন্যা, অশিক্ষিতা তিনি, কিসের জোরে চোখ রাঙাবেন!

নবাবও টের পেলেন যে, বেগম বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তিনিও কোন কৈফিয়ত দিলেন না, অনুতাপ মনে এলেও প্রকাশ করলেন না। শুধু মাঝে মাঝে স্ত্রীকে অকারণে বুকে টেনে নিয়ে অপরাধ স্খালনের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে আবার ভাবলেন যে, রোশানারা বড় ঠাণ্ডা, বড় উত্তেজনাহীন, বড় সুদূর।

ধীরে ধীরে দুজনের মাঝে এক অদৃশ্য দেয়াল খাড়া হয়ে গেল।

এদিকে ইনসিওরেন্সের কাজ আর জোটে না। অভাবে মাঝে মাঝে ধেনো খান আকবর আলি। শেষে তাও বন্ধ হল। নিরুপায় চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ দিল্লীর এক পিতৃবন্ধু হাজী নিজামুদ্দীনের আমদানি রপ্তানির ফারমে চাকরি নিয়ে সাউথ আফ্রিকা চলে গেলেন তিনি। সেখানে তাঁকে বছর-খানেক থাকতে হবে। এখানে রোশানারার জন্য রইল শুধু সাকিনা ও রোশানারা'র দূর সম্পর্কের এক অতিবৃদ্ধ আফিংখোর মামা রহমৎ খাঁ। আর যাবার আগে গোলাম বংশের মোহম্মদ ইউসুফকে তার বাড়ির ওপর একটু নজর রাখতে বলতেও বাধ্য হলেন আকবর আলি।

আফ্রিকা পৌঁছেই তিনি চিঠি দিলেন। বিদেশে, প্রিয়জনহীন নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত নবাবের চিঠিতে যে করুণ আবেদন ছিল তা রোশানারাকে একটু বিচলিত করল। কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে তিনি, লেখাপড়া জানেন না, চিঠির জবাব দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। খান সাহেবের স্ত্রীকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নিলেন বটে কিন্তু তাঁকে দিয়ে জবাবটা লেখাতে বাধল। খানসাহেবের বিবি একটু নাক উঁচু করে কথা বলেন, স্বামীর ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বহুদিনের গোলামীকে

যেন তিনি একাই মিটিয়ে ফেলতে চান। সুতরাং তাঁর কাছে আর গেলেন না রোশানারা, অথচ কড়া পর্দার আড়ালে মানুষ হয়েছেন তিনি, আর কাকে গিয়েই বা বলবেন এ কথা ?

রোশানারা পুরনো দাসী সাকিনার শরণাপন্ন হলেন। লিখতে জানে এমন কোন বিশ্বাসী ভাল লোক চাই।

সাকিনা বলল, "হায় আল্লা, আমি কাকে ডাকব ?"

রোশানারা বললেন, "কাকে ডাকবি জানলে কি আর তোকে জিজ্ঞেস করতাম ?"

"আচ্ছা খোঁজ নিয়ে দেখছি বেগম-সাহেবা"—

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এল সাকিনা, বলল, "একজন লোক পেয়েছি বেগম-সাহেবা—"

"কে ?"

'সোলেমান মিঞা—খানসাহেবের বাড়িতে থাকে, ওঁদের আশ্রিত, বড় গরীব কিন্তু বড় ভাল মানুষ বেচারা—এন্‌টেরেন্স পাশ—"

"কি করে ?"

"খানসাহেবের ভাইয়ের মণিহারী দোকানে কাজ করে—"

"আচ্ছা ডেকে আনিস বিকেলে—"

বেলা পড়তেই বাইরের ঘরে এসে সোলেমান দাঁড়াল। বিনীত, শান্ত লোকটি, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

সাকিনা গিয়ে রোশানারাকে খবর দিল।

রোশানারা বললেন, "তুই কাগজ কলম নিয়ে দে ও'কে—আমি আসছি—"

সাকিনা আদেশ পালন করল।

একটু বাদেই ভেতরের দিকের জাফরানী রংয়ের ভারী পর্দার আড়ালে টুং টাং চুড়ির শব্দ শোনা গেল।

সাকিনা মৃদুকণ্ঠে বলল, "বেগম-সাহেবা এসেছেন মিঞা—"

সোলেমান ঈষৎ ঝুঁকে বলল, "আদাব ব্যজালতাঁ হুঁ বেগম-সাহেবা—"

বেগমের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"আদাব"।

চকিতে একবার পর্দার দিকে কেন যেন তাকাল সোলেমান মিঞা, তারপর বিনীত মৃদুকণ্ঠে বলল, "বান্দা হাজির, হুজুরাইন আদেশ করুন—"

বেগম বললেন, "আপনার মেহেরবানির জন্য ধন্যবাদ মিঞাসাহেব, একটা চিঠি লিখে দিতে হবে—"

"জী ফরমাইয়ে—"

রোশানারা তখন বলতে শুরু করলেন আর সোলেমান তাঁর কথা গুছিয়ে পত্রাকারে লিখতে লাগল। অত্যন্ত মামুলী ভঙ্গীর চিঠি। প্রবাসী স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠা, তাঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ করা, নিজেদের কুশল সংবাদ দানের সঙ্গে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করা ইত্যাদি। একজন অনাত্মীয় পুরুষকে দিয়ে এর বেশী আর কি-ইবা লেখান যেতে পারে? তাই সে চিঠির মধ্যে প্রিয়তম, দিলবর, 'মেরে-আঁখকে রৌশন' কোন কথাই রইল না, রইল না বিরহতপ্ত হৃদয়ের আকুলতা, রইল না দিন-রাত ব্যাপী বিচ্ছেদের শূন্যতার কথা। সে চিঠির তলায় 'তোমারই' লেখা রইল না, চোখের জলের ধারাতে লেখিকার নামও ধৌত হ'ল না। শুধু লেখা রইল 'আপ্‌কা খাদ্‌মা'—আপনার সেবিকা রোশানারা।

চিঠি শেষ হল।

পর্দার দিকে তাকিয়ে সোলেমান সসম্ভ্রমে বলল, "জী—লেখা হয়ে গেছে—আর কোন আদেশ?"

রোশানারা বললেন, "আজ্ঞে না—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, শুধু

আরজ্ এই যে, মাঝে মাঝে দরকারমত যদি এমনি এক-আধটা চিঠি লিখে দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব”—

ঝুঁকে পড়ে সেলামের ভঙ্গীতে সোলেমান বলল, “বান্দা সব সময়েই সেবার জন্য তৈরি থাকবে—দরকার পড়লেই স্মরণ করবেন বেগম-সাহেবা—আচ্ছা আদাব”—

“আদাব”—

মনের মধ্যে কিসের যেন একটা ঘোর নিয়ে সোলেমান মিঞা সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সাকিনা বলল, “বেশ ভালো লোক, না বিবিসাহেবা ?”

রোশানারা মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, কথা শুনে তো ভাল বলেই মনে হল”—

“হ্যাঁ বিবি—লোকটা ভালই, তবে সব সময়েই বড় গম্ভীর হয়ে থাকে, আর কারো সঙ্গে মেশে না”—

“কেন ?”

সাকিনা ঠোঁট উল্‌টে বলল, “কেন তা খোদা জানেন—হয়ত লোকটার স্বভাবই অমনি বিবি”—

রোশানারা বললেন, “যে যার স্বভাব নিয়ে থাকুক না সাকিনা—আমাদের কি ?”

সাকিনা সায় দিল, “সত্যি তো—আমাদের কি”—

এমন সময় কাশি শোনা গেল, বুড়ো রহমৎ খাঁ এসে জানাল, “বেটি মেরা খোরাক্‌কে ওয়াস্তে—”

“দেতী হুঁ মামা”—

রহমৎ খাঁর আফিমের জন্য দৈনিক ছ’ আনা লাগে, মাসে দুবার করে কেনে বুড়ো। আফিং শেষ হয়ে এসেছিল তাই বুড়োর এই তাগিদ।

রোশানারা টাকা বের করতে করতে মনে মনে হাসলেন। আকবর

আলি ভাল রক্ষক বসিয়ে গেছেন। যদি রহমৎ খাঁ একটু লিখতে পড়তেও জানত তাহলেও হয়ত কাজে লাগত একটু, অন্ততঃ বাইরের লোককে ডাকতে হত না। চব্বিশ ঘণ্টা যে আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে তাকে দিয়ে তাঁর কি হবে ?

সপ্তাহে দুটো করে চিঠি আসতে লাগল। আফ্রিকার কালো মানুষদের মাঝখানে বসে রোশানারা বেগমের কথা যেন নতুন করে স্মরণ করলেন নবাব আকবর আলি। হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে তিনি যেন এই প্রথম বেগমের ভালবাসায় পড়লেন। সে ভালবাসা চিঠিতে প্রকাশ করার উপায়ও নেই কারণ তাঁর চিঠি যে আর কেউ পড়ে শোনাবে স্ত্রাকে তা তিনি জানতেন। ভাষা দিয়ে যে কথা প্রকাশ করার উপায় নেই, সেই কথাই তিনি যেন ঘন ঘন চিঠি লিখে জাহির করতে চাইলেন এবং প্রতি চিঠিতেই আবেদন জানাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি জবাব দেবার জন্য।

সুতরাং চিঠি লেখার জন্য মাঝে মাঝেই সোলেমান মিঞার ডাক পড়তে লাগল। আর এই চিঠি লিখতে এসেই এক বিচিত্র কাহিনীর সৃষ্টি করল সে। কোনো ঋতুর মন্ত্র দিয়েও যে ফুল ফোটানো যায় না, সেই আশ্চর্য ফুল তার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হল। সোলেমান মিঞা পাগল হল, মারা পড়ল, সেই ফুলের সৌরভে আফিং-এর চেয়েও তীব্র এক নেশা হল তার। জাফরানী রংয়ের পর্দার অন্তরাল থেকে যে মৃদু কণ্ঠস্বর তার কানে এসে পেঁৗছাতে লাগল তার মধ্যে যেন বিচিত্র এক সঙ্কেত খুঁজে পেল সে। সোলেমান মিঞার হৃদয়কুঞ্জ শিহরিত হল তোমাদের বৃন্দাবনের গোপিনীদের মত, তার মন যেন কৃষ্ণের বাঁশী শুনে বাহ্যজ্ঞান হারাল।

"কি লিখব বেগমসাহেবা ?"

"লিখুন যে আমার জন্য নবাব সাহেব কোন চিন্তা করবেন না—

অনর্থক দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। মামাজী আমাকে কোন কষ্টই পেতে দেন না—"

রোশানারা বলে যেতে থাকেন, আর সোলেমান লিখতে থাকে। বিকেলের রোদ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে এসে বিষণ্ন রহস্যের ছায়াপাত করে, কার্নিসের ধারে-বসা পায়রাদের কূজন যেন মনের এই বিচিত্র অনুভূতিকে ধারালো করে তোলে। বসন্তের সুরভি-নিঃশ্বাসের মত মৃদু অথচ উত্তেজক রোশানারা বেগমের কণ্ঠস্বর। সেই স্বর শুনতে শুনতে জাফরানী রংয়ের পর্দাটা যেন মসলিনের চেয়েও সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তার গায়ে যেন এক ললিত-দেহী রমণীর মূর্তি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। কিশোর বয়স থেকে নানা দুঃখের দিনে-রাতে সে যে মানসীর স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই মানসী যেন এতদিন বোবা ছিল, এই জাফরানী রংয়ের বিচিত্র যবনিকার মুখোমুখী হতেই যেন সেই বোবা নারী এতদিনে সবাক হল।

"আর কি লিখব হুজুরাইন?"

"লিখুন যে, নিজের শরীরের যেন যত্ন নেন নবাব সাহেব—অপরিচিত বিদেশে অসুস্থ হলে তো চলবে না—"

সোলেমান মিঞা লেখে। লেখে আর বেগমসাহেবার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে সে দেখে যেন সেই অন্তরালবর্তিনীর কালো চুলে কালো মেঘের সমারোহ, বাজপাখির ডানার মত বাঁকা তার ভুরু, ঠোঁটের রেখায় যেন রক্তগোলাপের নির্যাস, নার্গিস ফুলের মত সুকোমল দেহলতাকে ঘিরে তাঁর জরিদার পেশোয়াজ আর কুর্তা, চুমকি-বসানো ওড়না লুটোচ্ছে তাঁর মেহেদি-রাঙানো পায়ের কাছে।

হঠাৎ ঘোর কাটে, শোনা যায়,"আপনার খাদ্‌মা রোশানারা বেগম।" চিঠি শেষ হয়। আদাব করে বেরিয়ে যায় সোলেমান মিঞা। দরজার গোড়ায়, বাইরের রকটার ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে রহমৎ খাঁ

বিড়ি টানতে টানতে সাপের চোখের মত কুটিল দৃষ্টি মেলে তাকায় আর নেশার ঘোরে হাসে, তারপর বলে, "চিঠি লেখা হল? বেশ বেশ—তা শোন মিঞা, এর পরের বার আমার নাম করে লিখো তো—ওদিকে আফিং সস্তায় পেলে যেন বেশ কিছুটা নিয়ে আসে আকবর—লিখো কিন্তু, কেমন?"

ঘাড় নেড়ে চলে যায় সোলেমান।

তারপর একদিন কাটে, দুদিন কাটে। সোলেমান ছটফট করতে থাকে। কখন ডাক আসবে? আবার কখন সেই কণ্ঠস্বর শোনা যাবে?

শেষে তিনদিন বাদে ডাক আসে। ছুটে যায় সে।

"ফরমাইয়ে বেগমসাহেবা—"

"আগে এই চিঠিটা পড়ে দিন—আজই এসেছে—"

চিঠি পড়ে সোলেমান—তারপর জবাব লেখে।

"লিখুন যে, নবাব সাহেবের শরীর খারাপ জেনে আমরা চিন্তিত—দিনরাত আল্লার কাছে দুয়া চাইছি আমরা—তিনি যেন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে জলদি জলদি সেরে ওঠেন—"

ইচ্ছে করে দেরি করে লেখে সোলেমান। আগে যে চিঠি দশ মিনিটে লিখত, ক্রমেই তা পনরো, কুড়ি মিনিট ছাড়িয়ে আধ ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছয়।

"লিখেছেন?"

"জী লিখেছি—দুয়া চাইছি—তারপর?"

"তিনি যেন ভাল চিকিৎসার—"

"জী হাঁ—"

দেরি করে দোকানে ফেরে সোলেমান। খান সাহেবের ভাই আলতাফ রাগারাগি করে, শাসায়। সোলেমান চুপ করে থাকে।

তার কানের কাছে তখনো ঘুরছে সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। তারই সুখস্মৃতি বহন করে তার রাত কাটে, একটা দিন কাটে। কিন্তু তারপর আর কাটতে চায় না। সময়মত আফিং না পেলে রহমৎ খাঁর যে দশা হয়, তেমনি দশা হয় সোলেমান মিঞার। কণ্ঠস্বরের সেই ভোগবতী ধারার জন্য তার দেহমন তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওঠে।

এবার সে না ডাকতেই গিয়ে হাজির হয়, সাকিনাকে ডাকে, বলে বেগমকে খবর দিতে।

"কেন, আমাকেই বলুন না—" সাকিনা বলে।

"না, বেগমসাহেবাকে দরকার—"

সাকিনা খবর দেয়। পর্দার আড়ালে লঘু পায়ের শব্দ এসে থামে, পর্দাটা দুলে ওঠে, সোলেমানের শরীর-মন দুলে ওঠে।

"কি চাই?" রোশানারা প্রশ্ন করেন।

"কোন চিঠি পড়ার নেই?" সোলেমান বলে।

"আজ তো কোন চিঠি আসেনি।" রোশানারা বলেন।

"ওঃ—কিন্তু কোন চিঠি লিখতে হবে না?"

"পরশুই তো চিঠি লেখা হল—আবার চিঠি পাই, তারপর—"

"ওঃ—"

সোলেমানের কণ্ঠে হতাশা। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে, যতক্ষণ কথা বলে সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বরকে সে মদের মত চুমুক দিতে থাকে। সেই কণ্ঠস্বরে যেন বসন্তের পুষ্প-সমারোহ, চুম্বনের মদিরতা, স্পর্শের বিহ্বলতা। সেই কণ্ঠস্বর যেন অদৃশ্য আগুনের মত—তার রক্তের মধ্যেও আগুনের জ্বালা ছড়ায়।

কিন্তু সাকিনার ভুরু আজ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সোলেমান মিঞার চোখের তারাতে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে আজ সে যেন কিছু খুঁজে পায়।

ফেরার সময় বুড়ো রহমৎ খাঁ দেখে সোলেমানকে।

"কি হে মিঞা, ভাগ্‌নের কি খবর ?"

"আজ তো চিঠি আসেনি।"

"তবে কি লিখলে ?"

"আজ তো লিখিনি।"

"তবে ?"

"খোঁজ নিতে এসেছিলাম—"

আফিং-এর নেশায় ছলছল চোখ হঠাৎ সন্ধানী হয়ে ওঠে রহমৎ খাঁর, বলে, "বটে ! খোঁজ নিতে এসেছিলে ! তা ভালো—ভালো—"

কিন্তু সোলেমান আর রক্তমাংসের দুনিয়াতে থাকে না বলেই সে সাকিনার ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করল না, রহমৎ খাঁর চোখের চাউনিও সরল মনে হল তার কাছে। সে এখন শব্দের পৃথিবীতে থাকে, সে পৃথিবীতে শব্দ একটিমাত্র। একটি নারীকণ্ঠ।

ধীরে ধীরে মাথা খারাপ হয় সোলেমানের। আত্মকেন্দ্রিক, পৃথিবীতে একা সে আঘাতে আঘাতে মৌনতার আবরণে নিজের ক্ষত-বিক্ষত যে হৃদয়কে মুড়ে রেখেছিল সোলেমান, তা হঠাৎ বাস্তবতা থেকে ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। হিসেবে ভুল হয় তার, গ্রাহকদের কথা কানে যায় না তার। আলতাফের তিরস্কারে ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। দিন রাতের হিসেবও শেষে একাকার হয়ে যায়। একটা চিঠি লিখেই আর একটা চিঠি লেখার আকুলতায় অধীর হয়ে উঠে সে। কিছু চায় না সে, সে শুধু এই পথের কুকুরের অখ্যাত জীবনে একটিমাত্র ইন্দ্রজালকে প্রার্থনা করে, আমৃত্যু সে জাফরানী রংয়ের পর্দার সামনে বসে একটি কণ্ঠস্বরের ঝরনাধারায় অবগাহন করতে চায়, একটি সুরের আগুনে দগ্ধ হতে চায়।

এদিকে অনেক চোখ লক্ষ্য করতে থাকে সোলেমানকে, অনেক ভুরু কুঁচকে ওঠে তার দিকে তাকিয়ে, অনেকেই কানাকানি আর

হাসাহাসি করতে থাকে আলতাফের দোকান আর নবাব আকবর আলির বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু সোলেমান মিঞার হুঁশ নেই, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।

এবেলা চিঠি লিখেই একদিন ওবেলা গিয়ে হাজির হল সে।

সাকিনা অবাক হল, "কি চান মিঞাসাব?"

"চিঠি পড়তে এসেছি—"

সাকিনার চোখ জ্বলে উঠল, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—এই না ওবেলা এসেছিলেন?"

"আচ্ছা, বেগমসাহেবাকে খবর দাও সাকিনা—

"না—আপনি এখন যান।"

"একবার খবর দাও—একবার—"

"না—"

সোলেমান বিহ্বলের মত তাকাল, তারপর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠল, "বেগমসাহেরা—"

"সোলেমান মিঞা!" সাকিনা চেঁচাল।

কিন্তু রোশানারা বেগমের কানে ডাক পৌঁছেছিল, তাঁর দ্রুত পায়ের শব্দ এসে পর্দার ওপিঠে থামল।

সাকিনা বলল, "দরকার নেই, তবু এসেছে সোলেমান মিঞা, আমি যেতে বলছি তবু যাচ্ছে না—"

"কেন সাকিনা—কি হয়েছে?"

সোলেমান এক-পা এগোল, হিন্দুস্থানের কোনো এক সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যেন কথা কইছে এক ক্রীতদাস, এমনিভাবে ভঙ্গীতে সে বলল, "কোন চিঠি পড়তে হবে না বেগমসাহেবা?"

একটু নিঃশব্দতার পর আওয়াজ এল, "না।"

"তা হলে লিখতে হবে?"

"না।"

চোখের তারাতে বিচিত্র এক উত্তেজনার আলো নিয়ে সোলেমান বলল, "কিন্তু বেগমসাহেবা, কতদূরে, সেই জঙ্গলাকীর্ণ বিদেশে নবাব সাহেব একা একা দিন কাটাচ্ছেন, সেকথা কি আপনি ভেবে দেখেছেন? রোজ একখানা করে চিঠি লিখে তাঁর নিঃসঙ্গতার বেদনাকে কমান কি উচিত নয় আপনার?"

রোশানারা বেগমের গলাতে দৃঢ়তা ধ্বনিত হল, "মিঞাসাব, আমার কি করা উচিত আর অনুচিত তা আমি ভালভাবেই জানি—"

"আজ্ঞে?"

"আপনি এবার আসুন—"

"আচ্ছা আদাব—"

"আদাব—আর শুনুন—আবার ডাকলেই আপনি আসবেন, বুঝলেন?"

"জী হাঁ বেগমসাহেবা—" বলে নতমস্তকে ধীরে ধীরে সোলেমান চলে গেল।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে রহমৎ খাঁ এসে হাজির হল সেখানে। এইমাত্র সে তার বিকেলের বড়িটি গিলেছে। হেসে বলল, "আবার এবেলাও বুঝি চিঠি লেখা হল সাকিনা?"

সাকিনা মাথা নাড়ল, "জী না—"

"ওঃ"—বলে বুড়ো রহমৎ খাঁ বাইরে গেল। তার পাকা দাড়ি-গোফের আড়ালে একটা বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে গেল।

জাফ্রানী রংয়ের পর্দা সরিয়ে সাকিনা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল রোশানারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। খোলা জানালার ওপর চিক, তার ভেতর দিয়েও আকাশের রক্তমেঘ নজরে পড়ে। কার্নিসের ওপর পায়রাগুলো

অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে, তাদের কূজনের মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার পূরবী।

সাকিনা বলল, "বেগমসাহেবা, সোলেমান মিঞাকে আর কোনদিন ডাকবেন না।"

যেন চমকে উঠলেন রোশানারা বেগম, বললেন, "কেন ?"

"কেন ?" সাকিনা একবার থামল, তারপর তাকাল, বলল, "যদি গুস্তাকী মাপ করেন তো একটা কথা বলি"—

"বল"—

"সোলেমান মিঞা আপনার প্রেমে পড়েছে"—

"কি বললি !" রোশানারা বেগম যেন কেঁপে উঠলেন, তার চোখ জ্বলে উঠল, নাক ফুলে উঠল, ঘৃণা মেশানো সূক্ষ্ম একটা হাসির মত আভাস ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মারল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "আমাকে ভালবাসে !"

"হ্যাঁ—তার চালচলন লক্ষ্য করছেন না ? ক'দিন ধরেই আপনাকে বলব বলব করেও বলিনি, মহল্লার লোকেরা তো কানাকানি করছে। সোলেমান মিঞার পাগলামো এখন সবার চোখেই বড় হয়ে লাগছে"—

স্থির হয়ে সব কথা শুনলেন রোশানারা, সব শেষে বললেন, "তাহলে আর কোনদিন সোলেমান মিঞাকে বাড়িতে ঢুকতে দিস না।"

*

তারপর দ্রুত ঘটনা ঘটতে লাগল। সোলেমানের চাকরি গেল, মহম্মদ ইউসুফ তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে-দিলেন তাকে। কোন কাজে মন দিচ্ছিল না সে, পাড়ার লোকের কানাকানি খানসাহেবের কানে গিয়ে তাকে উত্তেজিত করেছিল।

ফুটপাথে আশ্রয় নিল সোলেমান। লালা কিষণলালের বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচেকার ফুটপাথে বসে থাকে সে, আর নবাব আকবর আলির বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাকিনা সেই খবর দিল রোশানারাকে।

"সত্যি ?" রোশানারা অবাক না হয়ে পারলেন না।

"হ্যাঁ"—

"হায় আল্লা !" রোশানারা সখেদে বললেন।

সাকিনা বলল, "লোকটির মাথায় বোধ হয় ছিট ছিল, এখন পাগল হয়ে গেছে"—

হঠাৎ করাঘাত শোনা গেল দরজায়।

সাকিনা দরজা খুলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করল।

"কে রে ?" রোশানারা ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন। সাকিনা জবাব দিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে সোলেমানের গলা ভেসে এল, "চিঠি এসেছে বেগমসাহেবা—চিঠি ?"

রোশানারা শুনতে পেলেন।

সাকিনা চেঁচিয়ে বলল,"না চিঠি আসেনি। আপনি যান"—

আর কোন শব্দ এল না।

বুড়ো রহমৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, চারদিকে একেবার কি যেন দেখল, তারপর নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসতে হাসতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল—

"কেয়া কঁহু কুছ কহাভী নহী যাতা
হায়, চুপ্ ভী র‍্যহা নহী যাতা।"

সোলেমান মিঞা পাগল হয়ে গেল। কোথায় খায় কেউ জানে না। ফুটপাথেই পড়ে থাকে সে। লোকেরা নিত্যদিন লক্ষ্য করে তাকে। ধুলো ওড়ে, বৃষ্টি পড়ে, রোদে তেতে ওঠে পাথরের ফুটপাথ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই উন্মাদের। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে আকবর আলির বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সে। যদি একটাও কথার টুকরো শুনতে

পাওয়া যায় তারই আশায়। তারপর আবার কি ভেবে সদর দরজায় ফিরে এসে করাঘাত করে চেঁচায়, "চিঠি লিখতে হবে না? চিঠি?"

দিন কাটে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে পাথরের মত বসে রোশানারা বেগম পাগলের সেই চীৎকার শোনেন আর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তারপরে তাও পুরনো হয়ে ওঠে, সয়ে যায় তাঁর। রোজ সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, রোজ রাস্তা দিয়ে গাড়িঘোড়া চলে, ফিরিওয়ালা ডেকে যায়, সামনের তেলের কলের সিটি তিনচারবার বাজে—সেই সঙ্গে একটা পাগলের চীৎকারও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু লোকেরা নিত্য নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়, রসালো আলোচনার খোরাক পায়। ওরা পাগলের দিকে তাকায় আর কত কি কল্পনা করে। মাঝে মাঝে একআধজন ছোকরা সোলেমানের পেছনে গিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, "চিঠি লিখবে মিঞা? চিঠি?"

সোলেমান চমকে তাকায়, তারপর মৃদু মৃদু হাসে। তারপর ভুলেই যায় ব্যাপারটা, কান পেতে কি যেন সে শুনবার চেষ্টা করে। হাওয়াতে কি কোন কণ্ঠস্বর ভেসে এল?

দশমাস বাদে একদিন আকবর আলি ফিরে এলেন। আর তাঁকে আফ্রিকা যেতে হবে না, এখন থেকে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর অফিসেই থাকবেন, মাইনেও বেড়েছে।

দশমাস বাদে এসে নতুন আবেগ নিয়ে রোশানারাকে তিনি মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্তে বুকের কাছে টানলেন। আর ঠিক সেই সময়েই নীচে থেকে ডাক ভেসে এল, "চিঠি লেখাতে হবে? চিঠি?"

সে ডাক শুনে সাকিনা ভয় পেল, রহমৎ খাঁ হাসল, রোশানারা চমকে উঠল।

আর আকবর আলি বললেন, "কে!"

রোশানারা শান্তকণ্ঠে বললেন, "এ পাড়ার এক পাগল—"

"পাগল ! তা চিঠি লেখাতে হবে বলছে কেন ?"

রোশানারা শীর্ণ হাসি হাসলেন, "পাগলের কথার অর্থ কি কেউ বোঝে ?"

আকবর আলি হাসলেন, "হ্যাঁ তা বটে।" তারপর আবার বেগমের দিকে তাকালেন। রোশানারার চোখের নীচে ক্ষীণ ছায়ার আভাস, রক্তের আভাও নেই গালে। রোশানারাও কি তাঁর কথা ভেবে তাঁরই মত জেগে থাকত মাঝে মাঝে ?

তিনি বললেন, "রোশানারা, দূরে গিয়ে তোমার দাম বুঝেছি। প্রতিদিন তোমার চিঠির জন্য কী আকুলতাই যে বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে। ওয়াজিদ আলি যখন কলকাতায় নির্বাসিত হলেন, সঙ্গে তাঁর সব বেগমেরা যাননি। বদর আল্‌ম বেগম রয়ে গেলেন এই লক্ষ্ণৌতেই। বেগমের মনের আকুলতার সঙ্গে মিল ছিল আমারো মনের—ওয়াজিদ আলির একটি চিঠি পেয়ে তিনি যে শের লিখেছিলেন, আমারো তাই মনে হত—

"তুমহারে খত্‌কো জ্যব দেখা
তনেমুর্দামেঁ জান আই
হুয়া সাবিত কি হ্যায় তহ্‌রীরমেঁ
ইজজে মসী হাই
বলায়ে হিজ্রমেঁ জ্যবসে ফঁসী হুঁ
ম্যায় অঙ্গারোঁকে উপর লোটতী হুঁ।"

তোমার চিঠি পেয়ে আমারও মৃতপ্রায় দেহে যেন নতুন প্রাণ আসত—সেই মুহূর্তে মনে হত যেন ভগবান আছেন। কি বলব রোশানারা, যেদিন থেকে বিচ্ছেদ শুরু হল, সেদিন থেকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপরেই শুয়ে ছিলাম—"

রোশানারা আবার শীর্ণ হাসি হাসলেন।

আকবর আলি প্রশ্ন করলেন, "চিঠি লেখাতে কাকে দিয়ে? খান সাহেবের বিবি?"

রোশানারা স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "না—"

"তবে?"

"ওদের বাড়ির এক সোলেমান মিঞা—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—আলতাফের দোকানে কাজ করে। তা লোকটার হাতের লেখাটা ভালই।"

কথাটা সেইখানেই থেমে গেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরোলেন আকবর আলি। লক্ষ্য করলেন যে, রাস্তার সবাই, পাড়ার সবাই তাঁর দিকে বিশেষভাবে তাকাচ্ছে। কেন? এতদিন বাদে ফিরেছেন বলেই হয়ত। খান সাহেবের বাড়িতেও কেমন যেন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। কেন?

সন্ধ্যার পর বাড়ির দিকে পা দিলেন আকবর আলি। লালা কিষণলালের গাড়িবারান্দার সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সোলেমান তখন নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে, "চিঠি লেখাবেন না বেগমসাহেবা? চিঠি?"

আকবর আলি চিনতে পারলেন। পাগল। চিনতে পারলেন যে সোলেমান মিঞাই পাগল।

পাগল তখন হেসে কবিতা আবৃত্তি করছে,

"মুহব্বৎমে নহীঁ হ্যয় ফর্ক

জীনে অওর মরণেকা

উসীকো দেখ্‌কর জীতে হ্যঁয়
যিস কাফিরপে দম নিকলে।"

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আকবর আলির মাথায় ঝড় উঠল। পাগল চিঠি লেখোনোর কথা কাকে বলছিল তা যেন আঁচ করতে পারলেন তিনি। আর ও কবিতা কেন আওড়াচ্ছে সে! 'প্রেমে পড়লে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও লোপ পায়—যে প্রিয়তম শত্রুর জন্য মৃত্যু হয় আবার তাকে দেখেই জীবন ফিরে আসে।' এই কবিতার অর্থ সোলেমান পাগলার জীবনে কি খুঁজে পাওয়া যাবে!

বাড়িতে ঢুকে তিনি সোজা রহমৎ খাঁর ঘরে ঢুকলেন। বুড়োর পেটে তখন আফিং-এর গুলি আর আস্ত নেই, আকবর আলিকে দেখেই সহাস্যে বলল, "আও বেটা—আও—"

"মামুজী—একটা কথা—"

"বল বাবা, বল—"

"সোলেমান পাগল হয়েছে কেন জানো?"

রহমৎ খাঁ তাকাল তাঁর দিকে, তারপর হাসল, বলল, "আজ থাক না, আপনা থেকেই জানবে—"

"না—আমাকে বল—এখুনি—"

রহমৎ আবার হাসল, "তাহলে বোস বাবাজী—সিগারেট আছে? একটা দাও দেখি—তুমি যখন জিদ করছ তখন বলতে হবে বৈকি—"

বেশ কিছুক্ষণ পরে শোবার ঘরে ফিরলেন আকবর আলি। দু'চোখ তখন লাল। সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

রোশানারা কাছে এসে বললেন, "শুলে যে, খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

আকবর আলি উঠে বসলেন, তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকালেন বেগমের দিকে, বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলেছ আমার কাছে।"

"কেন ?" রোশানারা তাকালেন পূর্ণ-দৃষ্টি মেলে।

"সোলেমান মিঞার 'চিঠি লেখাবে' কথার অর্থ সেদিন বলনি।"

রোশানারার ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটল, "তুমি সব শুনেছ ?"

"হ্যাঁ—শুনব না কেন ? সবাই যে সব কথা জানে।"

"আমার বলতে ঘেন্না হয়েছিল। আমার তো কোন দোষ নেই।"

"হুঁ—"

নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। আকবর আলি বিছানায় গড়িয়ে পড়েন। সাকিনা আজ ঘরের মধ্যে শখ করে বেল ফুলের মালা ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল—তার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী। কিন্তু তবু সেদিকে চোখ গেল না আকবর আলির। রোশানারাও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "খাবে না ?"

আকবর আলি প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, "না।"

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রোশানারার, দেখলেন যে আকবর আলি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। রোশানারা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ আকবর আলি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। উন্মত্ত আবেগে নিজের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "তোমাকে আমি এতদিন ভালো করে দেখিনি রোশানারা—এতদিন আমি শুধু অবহেলাই করেছি—"

কিন্তু এই ব্যগ্র আকুলতার মধ্যেও সেই পুরনো অনুভূতিটাই আরো তীব্র হয়ে ফিরে এল। রোশানারা বড় ঠাণ্ডা, বড় সুন্দর।

কিন্তু সেই অনুভূতির সঙ্গে কনিস বেগম আর ফিরোজা বাঈয়ের কথা আজ আর মনে পড়ল না আকবর আলির। শুধু এই অদম্য বাসনার আগুন বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল যে রোশানারাকেও জ্বলন্ত করবেন তিনি, তাঁকে নিজের নিকটতম আয়ত্তের মধ্যে টেনে আনবেন।

কিন্তু প্রেতের মত সেই ডাকটা শোনা যায় রোজ। 'চিঠি লেখাবেন বেগমসাহেবা? চিঠি?' আকবর আলির গায়ে যেন কশাঘাত হয় সেই শব্দে, তাঁর রক্তে যেন উন্মত্ততা টগবগ করে।

রাস্তায় বেরোলেই সোলেমানকে দেখতে পান তিনি। পাগল নিজের মনে বিড়বিড় করছে আর মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একটা অন্ধ উত্তেজনায় ছটফট করেন তিনি।

ক'দিন পরে সেদিন বিকেল থেকে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, জমে উঠল তাদের দ্বৈত গান, কিন্তু তখনো অফিস থেকে ফিরলেন না আকবর আলি।

সাকিনা বলল, "নবাব সাহেব বোধ হয় ঝড়বৃষ্টির জন্য আসছেন না—"

রোশানারা বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে—"

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল একটু বাদেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদও উঠল খানিক বাদে। থানার ঘণ্টা রাত ন'টা থেকে একটা পর্যন্ত বেজে গেল। তারপর এলেন আকবর আলি। এলেন মাতাল হয়ে, গান গাইতে গাইতে।

সাকিনা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকে রোশানারার সামনে দাঁড়িয়ে গান বন্ধ করলেন আকবর আলি।

"কি দেখছ বেগম?"

"তুমি মদ খেয়েছ।"

"খেয়েছি।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎই—সবই তো হঠাৎ বেগম-সাহেবা—মানুষ হঠাৎ জন্মায়,

হঠাৎ মরে—এও হঠাৎ।" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন আকবর আলি, হাসতে হাসতে বললেন,

'হঁসী আতী হ্যয় অপ্‌নে রোনেপর
অওর রোনা হ্যয় জগ্‌ হঁসাইকা।'

রোশানারা বললেন, "তার মানে?'

"মানে?" কাছে এলেন আকবর আলি, দু'হাতে বেগমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সব কথার কি মানে থাকে? মাতালের কথার কি অর্থ হয়? রোশানারা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে—"

"কেন?"

"জানি না। রোশানারা, তোমার চোখের তারা কী কালো, কী সুন্দর—"

"নেশার ঘোরে এসব আমাকে কেন বলছেন নবাব? আমি কনিস বেগম নই—"

আকবর আলি স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে চাইলেন, বিকৃতকণ্ঠে বললেন, "আমি জানি—কনিস বেগমের কথা আর মনে পড়ে না রোশানারা বেগম—আজকাল তোমার দাম আমার কাছে অনেক বেশী—"

রোশানারা চোখ বুজলেন। চোখ বুজে বুজে অনেকক্ষণ ধরে মাতাল নবাবের প্রেমগুঞ্জন শুনলেন, তারপর আকবর আলির নাক যখন ডাকতে লাগল তখন ধীরে ধীরে উঠে বাতিটা নিভিয়ে জানালা থেকে চিক সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। বৃষ্টিধৌত নির্মল আকাশে কোথাও মেঘের মালিন্য নেই, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোতে সমস্ত শহরকে যেন রুপোলী তবকে-মোড়া মনে হচ্ছে। ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে রোশানারা বেগমের হঠাৎ কান্না পেল। তাঁর সে কান্না কেউ শুনল না, শুধু চাঁদই শুনল।

পরদিন মহল্লার সবাই একটা জিনিস আবিষ্কার করল। সোলেমান

পাগলা নিরুদ্দিষ্ট। মহল্লার সমস্ত শব্দের মধ্যে পাগলের চীৎকারটা আজ আর ধ্বনিত হল না। সারা দিনের পর রোশানারারও কথাটা মনে পড়ল, ইচ্ছে হল একবার সাকিনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুচি হল না।

শেষে সাকিনাই এক সময়ে তাঁকে আড়ালে বলল, "আপদটা চলে গেছে বেগমসাহেবা—"

"কে ?'

"কে আবার—ঐ পাগলা—

"কোথায় গেছে ?" রোশানারা প্রশ্ন করলেন।

"তা কেউ জানে না।"

"হুঁ—"

আকবর আলি সেদিন রাতে এক বোতল মদ বগলে নিয়ে ফিরে এলেন। বাড়িতেই প্রকাশ্যে পান শুরু করলেন তিনি। রোশানারা কিছুই বললেন না। শুধু বসে বসে দেখতে লাগলেন যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতাকে দমন করার জন্য আকবর আলি উঠে-পড়ে লেগেছেন।

হঠাৎ তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে, "কি দেখছ ?"

"তোমায়।"

"কেন ?"

"তুমিও তো আমাকে দেখ।"

"দেখি—তোমার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করি।"

"কি দেখতে পাও ?" রোশানারা মৃদুকণ্ঠে বললেন।

"শুধু রক্ত-মাংস।"

"আমিও তাই দেখি।"

"শুধু তাই ? আর আমার মন ? তা দেখ না ?" আকবর আলি ঝুঁকে পড়লেন।

"তোমার মনের নাগাল এখনো পাইনি আমি—?"

"পেতেও তো চাওনি।"

রোশানারা হাসলেন,"খেলা তো একতরফা জমে না নবাব সাহেব—"

"বুঝেছি।"

সেদিন কাটে। তারপর আরো কটা দিন। রোজই একই পালা চলে। রোজই ঘরে বসে মদ খান আকবর আলি আর রোজই রোশানারা বসে বসে দেখেন।

সেদিন মদ ঢালতে গিয়ে রোশানারাই গেলাসটা এগিয়ে দিলেন। আকবর আলি হাসলেন।

"হঠাৎ এ কী বেগম?"

"সতীনের সঙ্গে সন্ধি করছি।"

"ভালো ভালো—" গেলাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে হাসতে লাগলেন আকবর আলি, 'সুন্দর বলেছ বেগম—"

হঠাৎ রোশানারা বলে উঠলেন, "একটা খবর শুনেছ—"

"কি?"

"সেই আপদটা ও মহল্লা থেকে চলে গেছে।"

"কে?"

"সেই পাগল—"

আকবর আলি ঢুলু-ঢুলু চোখ তুলে তাকালেন, রোশানারা আবার বললেন, "আবার ফিরে না এলেই বাঁচি এখন—"

রোশানারার একটা হাতের ওপর হাত রেখে আকবর আলি প্রশ্ন করলেন, "কেন বেগম?"

"কেন সে-কথাও বোঝাতে হবে তোমায়?"

মাতালের হাসি হেসে আকবর আলি গলা নামিয়ে বললেন, "আর ফিরে আসবে না সেই কাফির—"

"কেন ? তুমি কি করে জানলে ?"

আকবর আলি তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললেন "শ্‌ শ্‌ শ্‌—আস্তে—আমি—ওকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি রোশানারা—"

রোশানারাও গলার স্বর নামিয়ে বললেন, "তার মানে ?"

"মানে শেষ করে দিয়েছি।"

"না !" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন রোশানারা—"না—না—"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু কেন ?"

"কেন নয় ? রোজই ওর চীৎকার শুনব আমি, ওকে দেখব, লোকদের হাসি দেখব। ইজ্জৎ চলে গেলে আমি বাঁচতে পারব না বেগম—"

একটু চুপ করে থেকে রোশানারা বললেন,"যা করেছ ভালই করেছ—কিন্তু কি দিয়ে ওকে—"

আকবর আলি বললেন, "অতি সহজে—গোমতীর পুলের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি—"

রোশানারা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "চল ফাতেহা পড়ে আসি নবাব সাহেব—"

আকবর আলি অবাক হয়ে গেলেন, "কি বলছ তুমি !"

"হ্যাঁ, ফাতেহা না পড়লে, আমার মনে শান্তি হবে না—"

"তোমার এসব মিথ্যে ভয়—"

"না; আমি যাবই—যত বড় যুক্তিই থাকনা তোমার, তবু খোদার বিচারে এ খুন—"

"তোমার জন্যই খুন করেছি বেগম"—দাঁতে দাঁত চেপে বললেন নবাব সাহেব, "দরকার পড়লে আরো খুন করব—"

"তবু খুন খুনই—তা ছাড়া লোকটা তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি নবাব সাহেব—"

"ক্ষতি করেনি !"

"কি ক্ষতি করেছে বল ?"

"পাগলামি করে লোক হাসিয়েছে। তোমার আমার অপমান করেছে—"

"কিন্তু লোকেরা আবার ভুলেও যেত। পাগলের কথা কে মনে রাখে ? তা ছাড়া ক্ষতি লোকটারই হয়েছিল—সে পাগল হয়েছিল। খোদাই তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন—"

আকবর আলি চট করে উত্তর দিলেন না, শুধু বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল তাঁর ললাটের ওপর,ক্রমে চোখের তারাতে একটা নিষ্প্রভ দীপ্তিও ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল, তারপর ফিসফিস করে তিনি বললেন, "সেদিন থেকে কিন্তু আমার মনে আর শান্তি নেই রোশানারা বেগম—"

"তাহলে চল ফাতেহা পড়ে আসি—"তুমি শান্তি ফিরে পাবে।"

"শান্তি পাব ? আচ্ছা, তাহলে চল—"

বোতল থেকে আর একটু মদ ঢেলে এক চুমুকে শেষ করে আকবর আলি উঠে দাঁড়ালেন।

রোশানারা বললেন, "চলতে পারবে ?"

"পারব—কিন্তু গোমতীর পুল তো একটু দূরে, চল একটা টাঙা নিই—"

"চল।"

বোরখা পরে নবাবের পিছু-পিছু রোশানারা বাড়ি থেকে বেরোলেন।

বাইরের ঘরে আফিং-এর নেশায় বুঁদ রহমৎ খাঁ মৃদুকণ্ঠে চোখ না খুলেই বলল, "কে বাবা?"

নবাব ও বেগম একটিও কথা বললেন না। রহমৎ খাঁ আবার নেশার স্রোতে ভেসে চলল।

টাঙায় চড়ে তাঁরা দুজনে চললেন। নিঃশব্দে।

তখন এগারোটা বেজে গেছে, রাস্তাতে লোক চলাচল কমে এসেছে। টাঙাটা শহর-সীমান্তের অধিকতর নির্জনতার দিকে এগিয়ে চলল। চাঁদের আলোয় সব ঝকঝক করছে। মাঝে একটা বাড়ি থেকে কাওয়ালীর সুর ভেসে এল। সেই অদৃশ্য গায়কের কথাগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ছাপিয়েও ভেসে এল কানে:

'ইস্ ইশ্ক্নে রুসওয়া কিয়া—
ম্যঁয় কেয়া বতাঁউ কেয়া কিয়া
আহে দিল নাশাদনে অওর
আস্মাঁ প্যয়দা কিয়া।'

কথাগুলো শুনে নবাব আকবর আলি একবার বেগমের দিকে তাকালেন, দেখলেন রোশানারা অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন।

পুলের কাছাকাছি আসতেই আকবর আলি বললেন, "রোকো—"

টাঙাটাকে বিদায় করে দিলেন তিনি, তারপর স্ত্রীকে বললেন, "চল—"

হাঁটতে হাঁটতে পুলের মুখে এলেন তাঁরা, পুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। চন্দ্রালোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চারদিক। গোমতীর জল চিকচিক করছে গলানো রুপো হয়ে, নিরবচ্ছিন্ন স্তিমিত স্রোতের একটানা মৃদু শব্দে আর ঝিরঝিরে বাতাসে হঠাৎ নবাবের নেশা গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল।

"বেগম, এমনভাবে আর কোনোদিন হাঁটিনি আমরা।" আকবর আলি বললেন।

"না—" রোশানারা জবাব দিলেন।

একটু টললেন আকবর আলি, তাঁর গলা আবেগে কেঁপে উঠল এবার, তিনি আবার বললেন, "খোদার পৃথিবী কত সুন্দর বেগম—"

"হুঁ—"

"কিন্তু মানুষের মন এত কুৎসিত কেন?"

"হুঁ"

"বেগম—"

"উঁ?"

"কেউ নেই এই পুলের ওপর—বোরখাটা তুলে ফেল না—এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার মধ্যে একবার তোমার মুখটা দেখি—"

রোশানারা থামলেন, বোরখা তুললেন। নবাব আকবর আলির নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। রোশানারাকে কি আজই তিনি জীবনে প্রথম দেখছেন?

"কি দেখছো?" রোশানারা বললেন।

"তোমাকে।"

"আমি তো শুধু রক্ত-মাংস।" রোশানারা হাসলেন।

"না বেগম—আজ মনে হচ্ছে শুধু তাই নয়।" আকবর আলির গলা কেঁপে উঠল।

পা বাড়িয়ে রোশানারা বললেন, "তাহলে হয়ত চাঁদের আলোর জন্য অমন মনে হচ্ছে নবাব। এগিয়ে চল—"

কিন্তু ক' পা এগিয়েই হঠাৎ থামলেন আকবর আলি, বললেন, "এখানেই।"

"কী এখানে?"

নবাব আকবর আলি চারদিকে একবার তাকালেন, একটু টাল সামলে নিয়ে সুর নামিয়ে বললেন, "এখানেই এসে দাঁড়িয়েছিল সে—"

"কে" ? রোশানারা বেগমের কণ্ঠস্বরে কোন কৌতূহল নেই।

নবাব বিরক্ত হলেন, "সে—সেই পাগল—"

হঠাৎ যেন নড়ে উঠলেন রোশানারা বললেন, "কিন্তু এখানে এসেছিল কি করে ? কেন এসেছিল ?"

পুলের দেয়ালের ওপর হেলান দিলেন আকবর আলি বললেন, "আমিই আসতে বলেছিলাম তাকে, বলেছিলাম, 'যার হুকুমমত চিঠি লিখে লিখে তুমি পাগল হয়েছ, আবার তাঁর কথা শুনবে, তাকে একবার দেখবে ?' সে আমার দিকে একবার অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, কথা শুনব, দেখব।' আমি বলেছিলাম, 'তাঁকে দেখলে কি করবে তুমি ?' সে হেসে বলেছিল, ''শুধুই দেখব, দেখব আর তাঁর কথা শুনব—"

রোশানারা স্থির হয়ে শুনতে লাগলেন, একটুও নড়লেন না।

আকবর আলি বলে চললেন,''আমি তখন তাকে বলেছিলাম, কিন্তু বাড়িতে তো দেখা হবে না—পাড়ার লোকে নিন্দে করবে। তার চেয়ে তুমি গোমতীর পুলে রাত এগারোটায় এসো, সেখানে তুমি নির্জনে বেগমসাহেবাকে প্রাণভরে দেখবে।"—শুনে সে বলেছিল, 'যাব, আমি এগারোটায় পুলে হাজির হব।' ঠিক রাত এগারোটায় আমি এসে দেখলাম, সে দাঁড়িয়ে আছে—"

রোশানারা বললেন, "কোথায় ?"

"ঐ যে—ওখানে—"

"তারপর আমি তাকে বললাম, 'বেগম এসেছেন, কিন্তু তুমি মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, বেগমের লজ্জা হচ্ছে। আমি তোমাকে ঘুরতে বললে তবে ঘুরো।' সে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করব।' বলেই সে মুখ

ঘুরিয়ে দাঁড়াল, পুলের নীচেকার জলের দিকে তাকিয়ে রইল আর কি যেন বিড়-বিড় করে বলতে লাগল। আমি জুতোর শব্দ করে এগিয়ে এলাম ওর দিকে, তারপর জুতোটা খুলে পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঠিক তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে টের পেল না, একবার ফিরেও তাকাল না, গোমতীর জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তখনও সে কি যেন ভাবছে। এদিক ওদিক তাকালাম, দেখলাম কেউ কোথাও নেই—হঠাৎ পেছন থেকে তাকে তুলে ধরে নীচের দিকে ঠেলে দিলাম—"

আকবর আলির কথা থামতেই আচমকা একটা দমকা হাওয়া যেন গোমতীর গর্ভ থেকে উঠে এল, চিলের ঝাপটের মত নবাবের চোখে ধুলোর কণা ফেলে, অচঞ্চল রোশানারা বেগমের বোরখা দুলিয়ে পুলের ওপরে ইতস্ততঃ ছড়ানো শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে হুহু করে বয়ে গেল আর বহু দূর থেকে কোনো নাম-না-জানা পাখির ডাক ভেসে এল। অনেকটা মানুষের গলার মত। যেন সোলেমান মিঞা প্রেতলোকের ওপার থেকে ডাক দিল, 'চিঠি লেখাতে হবে বেগমসাহেবা ? চিঠি ?' আকবর আলি কেঁপে উঠলেন আর দমকা হাওয়ার শনশন শব্দটা মিলিয়ে গেল। আবার স্তব্ধতা ফিরে এল, গোমতীর জলকল্লোলের শব্দ মৃদু বিলাপের মত একটানা শোনা যেতে লাগল আর চাঁদের ভৌতিক আলোর নীচে বাসনা কামনায় জটিল এই পৃথিবীটা আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

রোশানারা বেগম বললেন, "কোথায় দাঁড়িয়েছিল সেই পাগলা, নবাব সাহেব ?"

আকবর আলি নিঃশব্দে আঙ্গুল তুলে দেখালেন। রোশানারা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, একবার ঝুঁকে জলের দিকে দেখলেন। জলের ওপর তরঙ্গভঙ্গে চাঁদের আলো ভাঙ্গা আরশির অসংখ্য ছাঁচের মত চমকাচ্ছে।

রোশানারা বললেন, "আমি এবার ফাতেহা পড়ছি। ততক্ষণ তুমি চোখ বুজে আল্লার নাম স্মরণ কর নবাব সাহেব—যেন তোমার পাপকে ক্ষমা করেন তিনি।"

আকবর আলি চোখ বুজলেন।

রোশানারা দুহাত বুকের সামনে অঞ্জলি করে ফাতেহা আবৃত্তি করতে লাগলেন। মৃদু, বিষণ্ণ অথচ ভারি মিষ্টি সেই সুর: হে খোদা, আমরা পাপের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তুমি আমাদের ক্ষমা কর। হে করিম, হে রহিম, এজীবনে মৃতের যে তৃষ্ণা মিটল না, যে স্বপ্ন সার্থক হল না, তা এবার তুমি মিটিয়ে দিও, সার্থক করো। হে আল্লা, তোমার জয় হোক।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর থেমে গেল। একটা খচমচ বেসুরো আওয়াজ। আকবর আলি চোখ খুলে মুহূর্তের জন্য দেখলেন যে, রোশানারা বেগম দেয়ালের ওপর থেকে জলের ওপর লাফ দিচ্ছেন। মুহূর্তমাত্র। সেই এক মুহূর্তে আকবর আলি পাথর হয়েই আবার নড়ে উঠলেন। সেই এক মুহূর্তেই আকবর আলি মৃত্যুকে নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন। তিনি মুহূর্তের জন্য দেখলেন যে, দুহাত সামনে প্রসারিত করে এক উড়ন্ত পরীকন্যার মত মুহূর্তমাত্র এক বিভ্রমের ছবি তৈরি করে রোশানারা বেগম ভারী পাথরের মত নীচে নেমে গেলেন। গোমতীর জলের ওপর ঝপাং শব্দে তাঁর দেহ পড়ল। মুহূর্তমাত্র। তার পরেই গোমতীর ঠাণ্ডা, গভীর, স্রোতসঙ্কুল জলের মধ্যে বেগম সাহেবার ইহজীবন নিমজ্জিত হল। দেয়ালের ওপর ঝুঁকে পড়ে পাগলের মত আকবর আলি আর্ত চীৎকার করে উঠলেন—"রো-শা-না-রা-আ-আ-আ—"

গোমতীর বুক থেকে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করল, "রো-শা-না-রা-আ-আ-আ—"

তারপর স্তব্ধ হয়ে গেলেন আকবর আলি। রোশানারার মৃত্যু যেন সমস্ত রহস্যের সমাধান করে দিল। সত্যকে উদ্ঘাটিত করল। মৃত্যুর মতই ভয়ানক সেই সত্য।

সাদিক হোসেন থামলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তাঁর কপালে। তিনি থামতেই ঘরের মধ্যে নৈশব্দ নেমে এল। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টি থেমেছে। হাতঘড়িতে রাত একটা।

রণবীর সিং বলল, "কিন্তু নবাব সাহেবের কি হল তারপর?"

সাদিক হোসেন মদের বোতলটা তুলে নিজের গেলাসের ওপর উপুড় করে মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু আসল গল্পতো তা নয়—এখানে উপসংহারটাও আমাদের বক্তব্য নয়"—

আমি বললাম, "কিন্তু রোশানারা বেগম? তুমি কি বলতে চাও"—

সাদিক হোসেন পূর্ববৎ হেসে ক্লান্ত, বিষণ্ণ গলায় বললেন, "বেশী ব্যাখ্যা করলে শিল্পের রস উড়ে যায় অশোক। হ্যাঁ, অস্বাভাবিক হলেও সত্যি রোশানারা বেগমও সোলেমান মিঞার কণ্ঠস্বর শুনে প্রেমে পড়েছিলেন—জাফরাণী রংয়ের পর্দার দুদিকে দাঁড়িয়ে দুজনে সেদিন একই সঙ্গে বিচিত্র এক বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সোলেমান মিঞার মনের কথা তবু টের পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু রোশানারার মনের কথা আঁচ করা যায়নি। হয়ত শায়র দাগের কবিতার কথা রোশানারাও বিশ্বাস করতেন—হয়ত মেয়েদের স্বভাবই এমনি—

'অপনে দিলকোভী বতাঁউ ন'
ঠিকানা তেরা
সব্‌নে জানা, জো পতা একনে
জানা তেরা।'

'তোমার ঠিকানা আমার নিজের হৃদয়কেও জানাই না, কারণ একজন জানলেই তা সবাই জানতে পারবে'—

হঠাৎ বহুদূর থেকে একটা ইঞ্জিনের হুইসলের শব্দ ভেসে এল—কূ-উ-উ-উ। মনে হল যেন হতভাগ্য আকবর আলির আর্ত চীৎকার ভেসে এল 'রো-শা-না-রা-আ-আ—'।

হুইসলের সেই তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে সাদিক হোসেনের দিকে একবার তাকালাম। হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, নবাব সাদিক হোসেন আর নবাব আকবর আলি বোধ হয় একই লোক।

